আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সুলতানুল মাশায়েখ

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
অনূদিত

মজলিস নাশরিয়াত-ই ইসলাম
(Academy of Islamic Publications)

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশ কাল ঃ
জুমাদাছ-ছানী ১৪২০ হি.
আশ্বিন ১৪০৬ সাল
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ঈসায়ী

প্রকাশনায় ঃ
মজলিস নাশরিয়াত-ই ইসলাম
বাংলাদেশ।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
হুমায়ূন কবির
আই.বি.আই.
৭৭, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

মুদ্রণ ঃ
তাওয়াক্কাল প্রেস
১০, নন্দলাল দত্ত লেন,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বাঁধাই ঃ
আল-আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।

পরিবেশনায় ঃ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

হক লাইব্রেরী
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৭৫.০০

Hazrat Khwaja Nizamuddin Awliya: Written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi in urdu, translated by A.S.M. Omar Ali into Bengali and Published by Majlis Nashriyat-e-Islam (Academy of Islamic Publications).

Price : tk. 75.00 only

দাদাপীর হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের রায়পুরী এবং
শায়খুত-তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী
(র)-এর অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশে।

পূর্বকথা

ওলী-আবদালদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস বিশ্বজনীন। তাই চীনের মত ধর্মহীন বরং ধর্মবিদ্বেষী রাষ্ট্রেও ক্যান্টনে (আধুনিক নাম গ্যাংচৌ) সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর কবর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে।[১] কট্টর সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে বিষাক্ত হিন্দুস্থানের আজমীরেও হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন সকলকেই হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর মাযারে ভিড় করতে দেখা যায়। আমাদের দেশেও হযরত শাহ জালাল মুজর্রদে ইয়ামানী থেকে শুরু করে শাহ মাখদুম রূপোশ, মখদুম শাহদৌলা, খান জাহান আলী প্রমুখ ওলী-আল্লাহ্‌র মাযারে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক হাজিরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এ সব ওলী-আবদালের ঐতিহাসিক চরিত্র ও জীবন কাহিনী ইতিহাস সম্মত বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রচনার তেমন কোন উদ্যোগ বড় একটা চোখে পড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবন কাহিনী একান্তই শ্রুতিনির্ভর ও লোক-কাহিনীভুক্ত। জনশ্রুতির জন্যে যেহেতু কোন দলীল-দস্তাবেজের প্রয়োজন পড়ে না, তাই এগুলোতে মূল বৃক্ষের চাইতে আগাছা-পরগাছারই প্রাধান্য বেশী লক্ষ করা যায়। স্বদেশের মাটিতে শায়িত ওলী-আবদালের জীবনেতিহাসের অবস্থাই যেখানে এই-সেখানে দূরবর্তী দেশের বুযুর্গানের তো কথাই নেই। তাই বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী ও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর মতো বুযুর্গানের ব্যাপারেও এমন বহু আজগুবী ও অসম্ভব কাহিনী প্রচলিত বই-পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি নবী-রসূলদের মুজিযাসমূহকেও হার মানায়। বিশেষত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার ব্যাপারে নিজাম ডাকাতের ওলী বনে যাওয়ার আজগুবী উপাখ্যান আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে।

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার কথা এদেশের লোকমুখে আরেকটি কারণে খুব বেশী প্রচলিত আর তা হচ্ছে, এদেশের ওলীকুল শিরোমণি হযরত শাহ জালাল মুজর্রদ ইয়ামানী (র)-র আরব মুল্লুক থেকে দিল্লী হয়ে এদেশে আগমন কালে দিল্লীতে হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। হযরত শাহ জালালের কামালিয়াতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে একজোড়া কবুতর উপঢৌকনস্বরূপ দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে এদেশে 'জালালী কবুতর' বলে পরিচিত হয়। তাই শাহ জালাল ভক্তমাত্রই খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ। এ হিসাবে খাজা নিজামুদ্দীন এদেশের জনমানুষের নিকট হযরত শাহ জালালের মতই অতি আপনজন। অথচ এই মহান ওলীর কোন নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ আমাদের হাতে ছিল না।

মুসলিম বিশ্বে বহুল পরিচিত এবং ১৯৯৮ সালে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী (Man

---

টীকা ঃ-১ ইনি সম্পর্কে মহানবী (স)-এর মামা ছিলেন। ২৪ হি./৬৪৮খৃ. সনে তিনি চীনে পৌঁছেছিলেন। ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশ উলামা প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে এ দীন লেখকের সে মাযার যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

of the year) হিসেবে ঘোষিত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (মাদ্দা জিল্লাহুল আলী) চরিত গ্রন্থ রচনায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত বলে স্বীকৃত। "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" রচনা করে তিনি তাঁর যৌবনের প্রারম্ভেই সুধী মহলে স্বীকৃতি লাভ করেন। তারপর মুসলিম জাহানসহ এ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলী-আবদাল ও ইসলাম প্রচারক বুযুর্গগণের জীবনী রচনায় তিনি হাত দেন। উর্দু ভাষায় ছয় খণ্ডে রচিত 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' নামক সিরিজ গ্রন্থটি এবিষয়ক তাঁর একটি কালজয়ী রচনা। এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার উপর যে দীর্ঘ আলোচনা করেন, বর্তমান পুস্তকটি তারই অনূদিত রূপ। কৃতি গ্রন্থকার এ পুস্তকে রূপকথার একজন নায়ককেই যেন সার্থকভাবে ইতিহাসের পরীক্ষিত কষ্টিপাথরে যাচাই করে সঠিক ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। খাজা সাহেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যপ্রাপ্ত দুইজন প্রখ্যাত শাগরিদ কর্তৃক সংকলিত 'সিয়ারুল আওলিয়া' ও 'ফাওয়াইদুল ফুওয়াদে'র মত তাঁর সমসাময়িক যুগে লিখিত পুস্তকাদির মত উৎস থেকে তিনি ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন বলে লেখক তাঁর পরিবেশিত তথ্যাদির যথার্থতার ব্যাপারে খুবই প্রত্যয়ী। তাঁর মত একজন জহুরীর চয়নকৃত হওয়ায় এবং তিনি নিজেও ঐ সিলসিলার একজন পথিকৃত হওয়ায় পাঠক হিসাবে আমরাও তাঁর উপর সঙ্গত কারণেই নির্ভর করতে পারি। ঠিক ঐ মানদণ্ডে যদি আমরা ঐ যুগেরই ওলী হযরত শাহ জালাল মুজর্রদে ইয়ামানীর মত আমাদের এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় ওলী -আল্লাহ্দের জীবন-চরিতকেও দাঁড় করতে পারতাম তা হলে কতই না উত্তম হতো! অন্তত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মত একটি প্রতিষ্ঠানের এরূপ একটি প্রকল্প থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

অনুবাদক মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী তাঁর শায়খের লিখিত এ পুস্তকটি ছাড়াও তাঁরই আরো কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য পুস্তকের অনুবাদ জাতিকে ইতিমধ্যেই উপহার দিয়েছেন। তাঁর এসব অনুবাদকর্ম জাতির কাছে যেমন সাদরে গৃহীত হয়েছে, তেমনি তাঁর শায়খ আল্লামা নদভীর আস্থা অর্জনে ও এজাযত প্রাপ্তিতেও সহায়ক হয়েছে। তাই এ পুস্তকখানার তৃতীয় প্রকাশের ভূমিকায় নতুন করে তাঁর কোন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এ ভূমিকা লেখকের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তিনি তাঁর 'নবীয়ে রহমত' ও আশু প্রকাশিতব্য "ইসলাম ঃ ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি"-এর পরিচিতি লেখানোর পর এ দীনকেই তাঁর বক্ষমান পুস্তকটিরও ভূমিকা লিখতে বাধ্য করলেন। আল্লাহ পাক গ্রন্থকার আল্লামা নদভী এবং তাঁর সুযোগ্য খলীফা মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীকে নিরোগ দীর্ঘায়ূ দান করে মুসলিম মিল্লাতের আরও কার্যকরী খিদমতের তওফীক দান করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ইমাম কক্ষ
বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদ, ঢাকা- ১০০০
তারিখ ঃ ১৬/০৯/৯৯ইং

অনুবাদকের আরয

আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত আলিম, ঐতিহাসিক ও বুযুর্গ, রূহানী মার্গের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, মুফাক্কির-এ ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ) লিখিত "সুলত'নুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া" (র)-র অমর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হল। যাঁর অশেষ কৃপায় এটি বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হল সেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই অসংখ্য শোকর ও সজূদ।

সুপ্রিয় পাঠকের কাছে এটা পরিষ্কার করতে চাই যে, বর্তমান গ্রন্থটি আল্লামা নদভী (মা. জি. আ)-র কোন পৃথক রচনা নয়। এটি তাঁর "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" নামক সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত রচনা। মূল গ্রন্থটি দীন অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে "ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক" নামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। এই নামের একটি বই-এ যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-র জীবনী রয়েছে বা থাকতে পারে– এটা অনেকের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব নয়। অথচ এই মহান ওলী ও বুযুর্গের অনেক ভক্ত-অনুরক্ত এদেশে আছেন যাঁরা এই মহান বুযুর্গকে একান্ত করে জানতে চান, জানতে চান তাঁর পূর্বাপর সমগ্র জীবন-কাহিনী ও জীবন-চরিত। আর এই জানাটা আরও বেশি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে ওঠে একারণে যে, এই মহান বুযুর্গ ওলীর জীবন-কাহিনী সম্পর্কে এদেশের অনেক মানুষের মনেই একটি বড় রকমের ভ্রান্তি রয়েছে আর তাহল, তিনি প্রথম জীবনে ডাকাত ছিলেন। বহু মানুষ খুনের পর কোন একটি ঘটনার মাধ্যমে তিনি অনুতপ্ত হন, আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করেন এবং অবশেষে একনিষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগী ও কঠোর কঠিন রিয়াযত-মুজাহাদা তথা সাধনার মাধ্যমে আওলিয়া হিসাবে খ্যাত ও পরিচিত হন। মূলত এই কাহিনীর মধ্যে সত্যের লেশ মাত্রও নেই। অথচ পাঠক মনে, এদেশের সাধারণ মানুষের মনে, যার মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই আছেন, এরূপ একটি কাহিনী গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে যা দূর করা যে কোন সত্যসন্ধানীর আবশ্যিক কর্তব্য।

অথচ এ বিষয়টি আমাদের কাছে এর আগে এভাবে ধরা পড়েনি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, বর্তমানে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহতারাম জনাব আ.জ.ম শামসুল আলম সাহেব এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমে দীন, দার্শনিক, বুযুর্গ, ঐতিহাসিক ও বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত আমার অনূদিত "ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক" (৩য় খণ্ড) থেকে "সুলত'নুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া" অংশটুকু আলাদা করে পৃথক পুস্তকাকারে ছাপার পরামর্শ দেন। এতে করে এহেন একজন বুযুর্গশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে সাধারণ জনমানসে বিরাজিত ভ্রান্তির নিরসন ঘটবে এবং তাঁর সম্পর্কে পাঠক একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

তাঁর এই পরামর্শ ও প্রস্তাব আমার মনে দাগ কাটে এবং এটা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু মূল লেখকের বর্তমানে মুহতারাম শায়খ ও মুরুব্বীর বিনা অনুমতিতে এ কাজে অগ্রসর হতে আমার মন সায় দেয় নি। আমি প্রায় সাথে সাথেই আমার শ্রদ্ধেয় শায়খ আল্লামা নদভী মাদ্দা জিল্লাহুল আলীকে টেলিফোন করে এ ধরনের একটি প্রস্তাবের কথা জানাই এবং তাঁর অনুমোদন কামনা করি। তিনি সানন্দে এর অনুমতি প্রদান করে অধমকে অনুগৃহীত করেন। একই সঙ্গে এ বই এর জন্য স্বতন্ত্র একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্যও আমার মুহতারাম শায়খকে অনুরোধ জানাই। তিনি কোন এক অবকাশ মুহূর্তে তা লিখবেন বলে জানান এবং আপাতত লেখকের ভূমিকা ছাড়াই ছাপার পরামর্শ দেন। অতঃপর সেই পরামর্শকে সামনে রেখেই কম্পোজের জন্য পার্শ্ববর্তী একটি প্রতিষ্ঠানে এর মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু তকদীরের লিখন বড় বিচিত্র। এক বছর আগে কম্পোজের জন্য দেওয়া হলেও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এবং বহু সংকট ও বিড়ম্বনা কাটিয়ে বর্তমানে পর্যায়ে পৌঁছতে লেগে গেল অনেকগুলো মাস। এজন্য আমি কাউকেই দায়ী করছি না। আল্লাহ্‌র শোক্‌র, অনেক বাধা পেরিয়ে হলেও অবশেষে পুস্তকাকারে পাঠকের হাতে তা তুলে দেওয়া সম্ভব হল। এজন্য অধম অনুবাদক পরম করুণাময়ের দরবারে পুনরায় শোক্‌র ও সজ্‌দা পেশ করছে।

মূল পুস্তকটি লেখার সময়ও এর লেখককে সংকট ও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান পুস্তকটি ছিল "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" নামক সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত রচনা। ইতোপূর্বে এ নামেই এর আরও দু'টো খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং তা পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষত লেখকের রূহানী উস্তাদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদির রায়পুরী (র) প্রকাশিত খণ্ড দু'টো পড়ে এবং তাঁর খানকাহে অনুষ্ঠিত মাহফিলগুলোতে পড়িয়ে এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ সিরিজের পরবর্তী খণ্ডগুলোর কাজ, বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডটির কাজ অবিলম্বে শুরুর জন্য তাগাদা দিতে থাকেন।

লেখকের ভাষায় ঃ

"এই দু'খণ্ডের পর তিনি তৃতীয় খণ্ডের জন্য তাগাদা দিতে থাকেন এবং এই খাদেম (গ্রন্থকার)-কে তা সম্পূর্ণ করার জন্য বার বার নির্দেশ প্রদান করেন। অনেক বার এমনও হয়েছে যে, আমি বাইরে থেকে যখনই তাঁর খেদমতে গিয়ে হাযির হয়েছি তখনই তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, তৃতীয় খণ্ড কি সমাপ্ত হয়েছে? কয়েকবার আমি আমার সংকট ও বিড়ম্বনার কথা তাঁকে জানাই। তিনি তা শুনেই বলে ওঠেন, অন্তত তৃতীয় খণ্ডটি শেষ করে ফেল। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারলেন যে, এই অংশটিতে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (রা)-এর আলোচনা থাকবে, তখন তিনি তাঁর রূহানী ও বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাগাদার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। এদিকে এই অধমের অবস্থা এই হয়েছিল যেন সে কলম রেখে দিয়েছিল এবং এ প্রসঙ্গে ইতি টানার উপক্রম হয়েছিল। জুন, ১৯৬১ সালে আমি একবার হযরত রায়পুরী সাহেবের খেদমতে হাযির হলে দেখতে পাই, হযরত খাজা (র)-এর মলফূজাতের সেই সংকলন পঠিত হচ্ছে যা আমীর খসরু (র) কর্তৃক সংগৃহীত ও 'আফজালুল ফাওয়ায়িদ'

নামে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং যা আমার এক প্রিয় দোস্ত তোহ্ফাস্বরূপ নিয়ে এসেছেন। এ সংকলনটি এমনই সনদবিহীন ও ভিত্তিহীন বর্ণনায় ভরপুর যে, তা শ্রবণ করাটাও কোন বিশ্লেষণী শক্তি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ব্যক্তি, এমন কি, সাধারণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষেও বোঝাস্বরূপ মনে হবে। এর সংগ্রাহক হিসাবে আমীর খসরু (র)-কে সম্পর্কিতকরণ আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূদরায (র), যাঁর ও সুলত'নুল মাশায়েখের ভেতর কেবল একটিই মাধ্যম রয়েছে এবং তাও হযরত চেরাগে দিল্লী (র)-এর, যিনি উক্ত আধ্যাত্মিক সিলসিলার নয়ন মণি এবং গুপ্ত রহস্যের অধিকারী, সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন্ যে, 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' ছাড়া মলফুজাতের যতগুলি সংকলন মশহুর হয়ে আছে-তার সবগুলোই বাহুল্য দোষে দুষ্ট ও অবিশ্বাস্য। যাই হোক, মজলিসে উক্ত কিতাব পঠিত হচ্ছিল। হযরত রায়পুরী কখনো কখনো এর কোন কোন অধ্যায়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তাঁর অর্ধনিমিলিত ও অর্ধ-উন্মীলিত অথচ চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি-যা কখনো কখনো এই গ্রন্থকারে উপরও পড়ছিল এবং ইশারা-ইঙ্গিতে বলছিল যে, যদি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কোন কিতাব খুঁজে পাওয়া যেত তা হলে এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য কিতাব হাতে নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠত না। তাঁর ঐ দৃষ্টি আমার অন্তরে গিয়ে তীরের মতো বিদ্ধ হ'ল এবং আমি সেখানেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, প্রথম অবকাশেই আমি অবশ্যই এ দায়িত্ব সম্পাদন করব এবং এ সওগাত আমাকে অবশ্যই পেশ করতে হবে।"

এরপরও এ কাজ সমস্যামুক্ত ছিল না। নানাবিধ সমস্যার দরুন অব্যাহত গতিতে এ কাজ অগ্রসর হতে পারে নি। বিভিন্ন রকমের বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে মাঝে মধ্যেই আটকে পড়েছে। লেখকের ভাষায় ঃ

"এ কাজ মাঝপথে আটকে পড়ার অন্যতম কারণ ছিল পথের বন্ধুরতা। ভারতীয় উপমহাদেশের আওলিয়ায়ে কিরাম, ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দ এবং মহান বুযুর্গগণের জীবনী সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর ভেতর বিরাট কলেবরের গ্রন্থও রয়েছে। কিন্তু যখন এ যুগের কোন গ্রন্থকার তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী একত্রিত করার মানসে কাজে নামেন এবং তাঁদের প্রকৃত কামালিয়াত, তাঁদের দীনী ও তবলীগী চেষ্টা-সাধনা, তাঁদের তা'লীম ও তরবিয়তের ফলাফল এবং তাঁদের মেযাজ ও প্রকৃতির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেন এবং এ যুগের লোকদের জন্য ঐ সব জীবন-বৃত্তান্ত শিক্ষণীয়, উৎসাহ-উদ্দীপক ও সাহসিকতামণ্ডিত করে তোলায় প্রয়াস পান, অধিকন্তু সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী ও পরিপূর্ণ মানব তথা ইনসানে কামিল হিসাবে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী ও অন্যান্য অবস্থা প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে প্রয়াস পান, প্রয়াস পান তাঁদের জীবনের সত্যিকার ও বিশুদ্ধ কাঠামো উপস্থাপিত করতে তখন বিদগ্ধ রচনাকারীকে দারুণভাবে নিরাশ হতে হয়, হতে হয় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন। কোন কোন সময় শত শত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ থেকে, এমন কি কতিপয় গ্রন্থ থেকেও একটি পৃষ্ঠা লিখবার মতো উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এভাবে মহান ও শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের জীবন-কাহিনীতে এমন সব বিরাট শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হয় যে, কোনরূপ কল্পনা, অনুমান ও ভাষার অলংকার -চাতুর্য দিয়েও তা পূরণ করা যায় না। গোটা পুস্তকের পৃষ্ঠার পর

পৃষ্ঠা কাল্পনিক গল্প, অলৌকিক কাহিনী ও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাবার মতো ঘটনাবলী এবং কল্পকাহিনীতে ভরপুর থাকে আর তাতে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের দুঃখজনক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক[১], যিনি স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ ও গ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্যকতা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের এত ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন যার দ্বিতীয় কোন নযীর বর্তমান যুগে মেলা দুরূহ, এই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা ও ঐতিহাসিক' ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত লোকদের জীবনী আটটি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন, তাঁকেও নিম্নোক্ত উপায়ে অভিযোগ পেশ করতে দেখা গেছে ঃ

"দেশের জন্য কি পরিহাস দেখুন, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের শত শত ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে, কিন্তু এগুলোর ভেতর কোন গ্রন্থই ঐতিহাসিকের বিশুদ্ধ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। যে কোন কিতাব হাতে নিন, মনে হবে-যদিও যুদ্ধের ময়দান ও বিলাস মাহফিলের গল্প-কাহিনী, বিউগল ও কাড়া-নাকাড়ার বর্ণনা থেকে এর কোন কোন পৃষ্ঠা মুক্ত, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার থেকে তা আদৌ মুক্ত নয়। ছন্দোবদ্ধ বাণী ও অলংকার-সমৃদ্ধ গাথার কাঁটাবর্ণে আপনার আঁচড় জড়িয়েও আপনি তা খুঁজে পাবেন না। এমতাবস্থায় কি করে আশা করা যায় যে, আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের জ্ঞান-সমৃদ্ধ জীবনের সঠিক চিত্র ক্রটিমুক্ত এ্যালবামে পাব? ঐসব বুযুর্গের কিছু কিছু জীবনী-গ্রন্থ পাওয়া যায় যাঁরা তরীকতের কোন না কোন সিলসিলার সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু এ এক নিদারুণ পরিহাস যে, আপনি যদি সেসব গ্রন্থ থেকে তাঁদের নাম ও বংশ-পরিচয়, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-যাপন পদ্ধতি ও জ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে চান তবে এসব ব্যাপারে সহায়ক একটি শব্দও তাতে পাবেন না। কাড়া-নাকাড়ার ও রণদামামার কাজ এখানে অবশ্য নেই, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার থেকে এর একটি পৃষ্ঠাও আপনি মুক্ত পাবেন না। দেখা যায়, ঐ সব গ্রন্থকারের সকল শক্তি ব্যয়িত হয়েছে ঐ সব মহান বুযুর্গের কাশ্‌ফ ও কারামত তথ্য অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনায় এবং তাঁদেরকে এই পর্যায়ে উপনীত করবার চেষ্টা চালানো হয়েছে যেন তাঁরা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের উর্ধ্বের অপর কোন সৃষ্টি, আদৌ এ জগতের কেউ নন। মনে হয় তাঁরা খান না, পান করেন না, শয়ন করেন না এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান-সাধনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক কিংবা প্রয়োজনীয়তাই নেই। তাঁদের কাজ শুধু যেন এই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রাকৃতিক বিধান সর্বদাই ভেঙে চুরে খান খান করে যাবেন এবং প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত ও বস্তু জগতের চারটি মৌলিক পদার্থের (আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি) উপর যে কোন উপায়ে নিজেদের শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবেন।

"এ মুহূর্তে আপনি যদি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান তবে ভারতীয় উপমহাদেশের চিশতীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা বরং আর এক দিক থেকে এই উপমহাদেশে ইসলামী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনউদ্দীন চিশতী (র)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করুন এবং তা থেকে সংক্ষিপ্ত কোন জীবনী

১. গুলে রা'না, ইয়াদে আয়্যাম ও নুযহাতুল খাওয়াতির-এর লেখক মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই (র)।

প্রণয়নে প্রয়াসী হোন, সম্ভবত আপনার মনে হবে, যুগটা যেন ইসলামের প্রাথমিক যুগ, গ্রন্থ রচনা ও কিতাবাদি প্রণয়ন যুগের সূচনাই যেন এ সময় হয়নি। বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা নয়। কেননা এ যুগেই আমরা কাযী মিনহাজ উদ্দীন 'উছমানী জুযেজানীর 'তাবাকাতে নাসিরী' এবং নূরউদ্দীন আওফীর কিতাব 'লুবাবুল আলবাব'-এর সাক্ষাত পাই। এ দুটো কিতাবই হিজরী সপ্তম শতাব্দীর রচনা। আর যদি তা কোন মতে মেনেও নেওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে কী বলা যাবে যে, শায়খুল ইসলাম হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র), যিনি ছিলেন একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সংস্কারক, যিনি তাঁর যুগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং এমন একটি শহরে জীবনপাত করেছিলেন যা ছিল সে যুগে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র, যে যুগে রাজনৈতিক অবস্থার ভেতর ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তথাপিও এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে এবং তাঁর কার্যাবলীর ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। অথচ তাতে অদ্ভুত ও অলৌকিক কাহিনী এবং কাশ্‌ফ ও কারামতের ঘটনাবলীর কোন কমতি দেখা যায় না।"

তারপর লেখক বলেন ঃ

"একদিক থেকে হযরত সুলত'নুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের অধিকারী। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কোন তরীকতপন্থী নেতার এবং কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবন-বৃত্তান্তই এতখানি আলোকোজ্জল নয় যতখানি উজ্জল এই মহান বুযুর্গের। এ উপকরণ এদিক থেকেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যে, সেগুলো তাঁর মলফূজাত ও চিঠি-পত্রাদি (মকতূবাত) থেকে অথবা সমসাময়িক ইতিহাস এবং তাঁর খাদেম ও মুরীদানের লিখিত কিতাবাদি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ দিক দিয়ে ঐতিহাসিককে এখানে সর্বাপেক্ষা কম সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য বাছাই ও পর্যালোচনার কাজ এখানেও অপরিহার্য। কেননা সংঘটিত ঘটনাবলী ও সন-তারিখ নিয়ে অত্যন্ত বিশৃংখল ও পরস্পরবিরোধিতা এখানেও দৃষ্টিগোচর হয়।

"কিন্তু এই মহান বুযুর্গকে বেছে নেবার কারণ এ নয় যে, তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ অত্যন্ত সহজেই হস্তগত হয়। এটা অন্যান্য আরও কিছু ব্যক্তিত্বের বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে তাঁকে বেছে নেবার কারণ হল, তিনি ইসলামী রেনেসাঁর ইতিহাসে সম্মানিত আসনের অধিকারী এবং ভারতীয় উপমহাদেশে (যা সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে মুসলিম জাহানের কেন্দ্রবিন্দু এবং নবজাগরণ ও রেনেসাঁ আন্দোলনেরও উৎসভূমি) সংস্কারধর্মী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, যা তাঁর যুগ ও পরবর্তী বংশধরদের সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে।"

এই মর্মে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদ বুযুর্গের জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালা বাছাই ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি যেই নীতিমালা অনুসরণ করেছেন সে সম্পর্কে বিবরণ পেশ করতে গিয়ে লেখক বলেন ঃ

"জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালা বাছাই ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার সব সময় সে সব অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন যা বর্তমান বংশধরদের জন্য উপকারী, শিক্ষণীয়, অনুকরণীয়, সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক এবং যাতে

ভুল বোঝাবুঝি ও গলদ আচরণের আশংকা কম এবং কাল্পনিক ও নৈতিক দর্শনের সঙ্গে কম সম্পর্কযুক্ত। কেননা ঈমান ও য়াকীন, ইশ্‌ক ও মুহব্বত, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাস্তব জীবনাদর্শ (সুন্নাহ) অনুসরণের প্রেরণা ও আবেগ, অটুট সংকল্প ও মনোবল, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি আগ্রহ, আমল ও আখলাকের সংস্কার, বিশুদ্ধ ইল্‌ম ও ধর্মীয় বিধান অধ্যয়ন ও অনুসরণই ছিল এই বুযুর্গের মূল সম্পদ এবং তাঁর জীবনেতিহাসের আসল পয়গাম।"

গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত সেই বইটিই এখন পাঠকের হাতে। গ্রন্থকার এ বইটি লিখতে গিয়ে সর্বাধিক নির্ভর করেছেন ও সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য পেয়েছেন আমীর খোর্দ প্রণীত 'সিয়ারুল আওলিয়া' এবং আমীর হাসান আলা সিজযী প্রণীত 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' নামক দু'টো গ্রন্থ থেকে। কারণ এ দুটো গ্রন্থেই হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-র জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালার সর্বাধিক বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে। এরপর সর্বাধিক উপকৃত হয়েছেন গ্রন্থকারের মুহতারাম ওয়ালেদ মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই লিখিত "নুযহাতুল খাওয়াতির" নামক গ্রন্থ থেকে। ফলে ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ভর হবার কারণে পাঠক এ বই থেকে সুলত'নুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রা)-র ঘটনাবহুল জীবন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর বহুমুখী অবদান সম্পর্কে যেমন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ জানতে পারবেন, তেমনি এই মহান বুযুর্গ সম্পর্কে এতদিনের বিরাজিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনেও সক্ষম হবেন। সঙ্গত কারণেই আমরা এই দাবিও করতে পারি যে, ইতোপূর্বে ব্যতিক্রম বাদে আর কোন ওলী-বুযুর্গের জীবন-পঞ্জীই এতখানি ইতিহাস-নির্ভর হয়ে প্রকাশিত হয় নি যতটা সম্ভব হয়েছে আলোচ্য এই পুস্তকের বেলায়। এক্ষণে আমরা এই বুযুর্গকে বিস্তারিত জানব এবং তাঁর আমল-আখলাক ও জীবনাদর্শকে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। আর কেবল সেক্ষত্রেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানা সার্থক হবে এবং সেই জানা আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে, বয়ে আনবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

পরিশেষে, রহমানুর রহীমের দরবারে ঐকান্তিক মুনাজাতঃ মেহেরবান মালিক! দীনের এই দাঈ ও মুবাল্লিগ, তোমার মকবুল বান্দার উপর লিখিত এই জীবনী গ্রন্থটি তোমার অপার করুণায় কবুল কর এবং একে এর প্রকাশের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত সকলের নাজাতের ওসিলা বানাও। সেই সঙ্গে পাঠককে এর থেকে উপকৃত হবার তৌফিক দান কর। শাহানশাহ হে মালিক! মূল গ্রন্থের লেখক রিক্ত ও সর্বহারা মুসলিম উম্মাহর নে'মত আল্লামা নদভীকে তুমি নিরোগ দীর্ঘায়ু দান কর। তাঁর মুবারক সান্নিধ্য ও ছায়া থেকে আমরা তথা গোটা উম্মত যেন আরও দীর্ঘ কাল ধরে উপকৃত হতে পারি, ফয়েজ লাভ করতে পারি, 'সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন'-এর প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে তোমার শাহী দরবারে এটাই অধমের একান্ত প্রার্থনা।

আহকার

তারিখ ঃ ১৯/০৯/৯৯ইং — আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

▼ সূচীপত্র ▼

প্রথম অধ্যায় ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

❖

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে চিশতীয়া সিলসিলা এবং সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গগণ

ইসলামী বিশ্বের নতুন আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কেন্দ্র

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী (খ্রিস্টীয় ১২শ শতাব্দী) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। এ শতাব্দীরই শেষ ভাগে বিশাল বিস্তৃত ইসলামী বিশ্বে এমন এক সুবিশাল নতুন রাষ্ট্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছিল যা প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবীয় যোগ্যতা ও প্রতিভায় ছিল পরিপূর্ণ এবং যার ললাটে নিকট-ভবিষ্যতে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ও পয়গামের বিশ্বজয়ী কেন্দ্র ও ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক ও আমানতদার হওয়ার কথা লেখা ছিল।

এ শতাব্দীর প্রাক্কালেই অর্ধ-বন্য তাতারীদের আক্রমণ সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর পঙ্গপালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুর বন্য অত্যাচারে দেশের পর দেশ, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, শহরের পর শহর, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থান, শিক্ষায়তন ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমিসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শহরের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা, জীবনের অটুট বাঁধন, ভদ্র ও মর্যাদাশীল লোকদের মানসম্ভ্রম সবই ধূলোয় মিশে যায়। বুখারা, সমরকন্দ, রেয, হামদান, জুনযান, কুযভীন, মার্ভ, নিশাপুর, খাওয়ারিযম এবং শেষ পর্যন্ত খেলাফতের কেন্দ্র ও ইসলামের আবাসভূমি বাগদাদ ও এ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয় এবং তার অতীত ও সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এরূপ আকস্মিক বিপদ ও দুর্যোগের শিকারে পরিণত হয়ে মুসলিম জাহানের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে ওঠে এবং সমগ্র প্রাচীন ইসলামী বিশ্বের উপর রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। এ সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভারতবর্ষই কেবল একটি দেশ যা দুনিয়াব্যাপী এ অশুভ ফেতনা ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানে তখন প্রাণবন্ত, শক্তিশালী, অত্যুৎসাহী, আবেগদীপ্ত তুর্কী বংশোদ্ভূত লোকদের রাজত্ব চলছিল যারা ছিল ঐ সমস্ত তাতার ও মোগলদের আক্রমণের অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম। তারা নিজেদের

ঈমানী শক্তি ও ইসলামের নবোদ্দীপ্ত উৎসাহ- আবেগের ভিত্তিতে সমর শক্তি, রণকৌশল ও সাহসিতায় কেবল ওদের সমকক্ষই ছিল না বরং তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠতর ছিল। তাতার ও মোগল বাহিনী বারবার ভারতবর্ষের উপর হামলা চালাতে থাকে এবং প্রতিবারই প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হটতে থাকে। একমাত্র সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালেই চেঙ্গীয খানের বংশধর মোগলরা পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। প্রথম আক্রমণ ঘটে ৬৯৬ হিজরীতে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম আক্রমণ পরিচালনাকালে সুলতানের পক্ষ থেকে মালিক তুগলক (মালিক গাযী) এমন বীরত্ব ও রণনৈপূণ্য প্রদর্শন করেন এবং মোগলদের এমনভাবে পরাজিত করেন যে, "সেদিন থেকে ভারতবর্ষের স্বপ্ন মোগলদের মন-মগজ থেকে উঠে যায় এবং তাদের লোভাতুর দৃষ্টি চিরদিনের জন্য ঘোলাটে ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।"[১]

মুসলিম বিশ্বের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর কাছে মানসম্ভ্রমঈমান-'আকীদা ছিল অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও মহোত্তম হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন তাঁরা নিজেদের দেশে শান্তি ও জীবনের নিরাপত্তা লাভে বঞ্চিত হয়ে অবশেষে শান্ত ও নিরাপদ ইসলামের এই নতুন আবাসভূমি ভারতবর্ষের দিকে দলে দলে হিজরত করতে শুরু করেন। যোগ্যতম ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের এবং অভিজাত ও ভদ্র পরিবারবর্গের হিজরতকারী এ কাফেলা বন্যার বেগে ইরান, তুর্কিস্তান ও ইরাক থেকে ভারতবর্ষের দিকে আছড়ে পড়তে থাকে, যার ফলে দিল্লী একটি আন্তর্জাতিক শহরে ও এককালের মুসলিম সাম্রাজ্যের গৌরব বাগদাদ ও কর্ডোভার ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। শুধু দিল্লীই নয় বরং ভারতবর্ষের অন্যান্য শহর ও শহরতলীগুলো পর্যন্ত শীরায ও য়ামানের সমকক্ষতা লাভ করে। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বার্ণী প্রমুখ এ সমস্ত অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশ-গোত্রের, খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর, মশহুর উলামায়ে কিরামের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর, ইসলামের সুমহান ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ মনীষীদের নামের যেই তালিকা পেশ করেছেন যাঁরা তাতারী ফেতনার পরিণতিতে ভারতবর্ষে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পরে এখানে শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার তথা জনগণের ব্যাপক আত্মশুদ্ধির অভিযানে মনোনিবেশকরেছিলেন– অধিকন্তু সাম্রাজ্যের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বও সামলিয়ে ছিলেন এবং যাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু, তাতে মনে হয় তখন সমগ্র ইসলামী বিশ্বের আভিজাত্য, মর্যাদা ও মহত্ত্বের এখানেই যেন সমাবেশ ঘটেছিল।[২]

---

১. মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ, পৃষ্ঠা ১৮৬ ও তারীখে ফীরূযশাহী, ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বাণীকৃত-পৃষ্ঠা ২১৫, ৩০২, ৩২০ ও ৩২৩।

২. তারীখে ফীরূযশাহী দ্রষ্টব্য– পৃষ্ঠা ১১১ ও ১১২।

এই বিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষ শুধু মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশেই পরিণত হয় নি বরং ইতিহাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এদিকেই ছিল যে, সে (ভারতবর্ষ) ইসলামের চিন্তা ও আত্মিক শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব ও পুনরুজ্জীবনেরও নতুনতর কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। উপরন্তু ইসলামের জ্ঞান-গবেষণা, ঈমানের বিপ্লবী দাওয়াত ও 'আকীদার অটুট ও দৃঢ়সংকল্পের ইতিহাস রচয়িতাদের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে এরই উপর সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

মুসলিম ভারতের স্থপতি

মুসলিম বিশ্বের জন্য ভারতবর্ষের আবিষ্কার ও প্রাপ্তি একটি নতুন দুনিয়া আবিষ্কার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই এখানে ইসলামের উৎসাহদীপ্ত কাফেলার আগমন ঘটেছিল এবং ৯৩ হিজরীতে ইসলামের বীর সন্তান মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম ছাকাফী সিন্ধু থেকে মুলতান অবধি সমগ্র এলাকা তলোয়ার ও চারিত্রিক মাধুর্যের সাহায্যে মুসলিম অধিকারে আনয়ন করেন। অধিকন্তু এ উপমহাদেশের স্থানে স্থানে দ্বীপ ও উপদ্বীপের ন্যায় ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দের কেন্দ্র ও খানকাহসমূহ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলো অন্ধকার রাত্রিতে প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রদীপের ন্যায় আলো বিকিরণ করছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ বিজয়ের পুরো কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দুঃসাহসী ইসলামের বীর সৈনিক সুলতান মাহমূদ গযনভী (৪৪১ হি.) এবং ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (৬০২ হিজরী)। আর এখানে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ঈমানী বিজয় প্রতিষ্ঠার মূল স্থপতি হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) (জন্ম ৬২৭ হিজরী)।

ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালেই ইসলামের প্রসিদ্ধ চারটি আধ্যাত্মিক সিলসিলা কাদিরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া ও সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকা জন্মলাভ করেছিল এবং বেশ কিছুকাল থেকেই ফলে-ফুলে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল। নিজস্ব সময় ও সুযোগ মুতাবিক এদের প্রত্যেকটিরই ফয়েয ও বরকত ভারতবর্ষে পৌঁছে যায় এবং ভারতবর্ষের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণে সবগুলো সিলসিলারই সম্মিলিত অবদান রয়েছে। আল্লাহ পাকও তাঁদের প্রচেষ্টাকে ধন্য করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিজয়ে এবং এখানে ইসলামের চারা রোপণে (যার ছায়া ও ফল লাভে দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ উপকৃত হতে যাচ্ছিল) আল্লাহ্‌র কুদরতী বিধান চিশতীয়া সিলসিলাকে বেছে নিয়েছিল। "আর

তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা পয়দা করেন ও যেমনটি ইচ্ছা বাছাই করেন।" (আল-কুরআন)

আল্লাহ্‌র এ সমস্ত গুপ্ত-রহস্য ছাড়াও চিশতীয়া তরীকার উপর আমাদের এ দেশের প্রতিবেশীসুলভ অধিকারও ছিল। চিশতীয়া সিলসিলা আমাদের দেশেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানে উজ্জ্বলতররূপে বিকশিত হচ্ছিল। স্বীয় সংবেদনশীল মেযাজ, প্রেম ও ভালবাসাভিত্তিক হবার কারণে– যা চিশতীয়া তরীকার মৌলিক পুঁজি ও মূলধনও বটে– এ সিলসিলা ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দের অন্তর-মন জয় এবং স্বীয় প্রেমে পাগলপারা ও মাতোয়ারা করতে যে খুব সহজেই সক্ষম হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ভূমির প্রাণসত্তা ও কাঠামো প্রেম ও বেদনার জারক রসে সঞ্জীবিত।

ভারতবর্ষের সাথে চিশতীয়াদের প্রাথমিক সম্পর্ক

উপরে উল্লিখিত জানা-অজানা গুঢ় রহস্য ও কৌশলসমূহের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ীই ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের পরিচিতি ও প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে চিশতীয়া সিলসিলাকে নির্বাচিত করেন। আর চিশতীয়া তরীকার ধারক ও বাহক মহান সন্তানদের প্রতি ভারতবর্ষের দিকে গতি পরিবর্তনের গায়েবী ইঙ্গিত আসে। সর্বাগ্রে চিশতীয়া তরীকার যে বুযুর্গ সাধক ভারতবর্ষের দিকে নিজের গতিধারা পরিচালিত করেন তিনি ছিলেন খাজা আবূ মুহাম্মদ চিশতী'[১] যাঁর দু'আ, পবিত্র ও বরকতময় অস্তিত্ব সুলতান মাহমূদ গযনভীর ধারাবাহিক বিজয়ের পেছনে সদা ক্রিয়াশীল ছিল। মাওলানা জামী 'নাফাহাতু'ল-উন্স' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"যখন সুলতান মাহমূদ সোমনাথ[২] আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখনই খাজা আবূ মুহাম্মদ গায়েবী নির্দেশ পান যেন তিনি সুলতান মাহমূদের সাহায্যার্থে গমন করেন।

---

১. খাজা আবূ মুহাম্মদ চিশতী (মৃত্যু ৪০৯ অথবা ৪১১ হিজরীতে) খাজা আবূ আহমদ চিশতীর পুত্র ও খলীফা ছিলেন যিনি খাজা আবু ইসহাক শামীর সর্বপ্রধান খলীফা এবং খাজা নাসিরুদ্দীন আবূ য়ূসুফের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। খাজা নাসিরুদ্দীন আবু য়ূসুফ আবার খাজা কুত্‌বুদ্দীন মওদুদ (র)-এর পীর ছিলেন এবং তিনি (খাজা কুত্‌বুদ্দীন মওদুদ চিশতী) হাজী শরীফ যিন্দানীর পীর; শরীফ যিন্দানীর খলীফা হাজী খাজা উছমান হারূনী এবং খাজা উছমান হারূনীর খলীফা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)।

২. সুলতান মাহমুদ ৪১৬ হিজরীতে সোমনাথ আক্রমণ করেন। যদি উল্লিখিত বছর (৪০৯ অথবা ৪১১ হিজরী) খাজা আবূ মুহাম্মাদ চিশতীর ঠিক মৃত্যু সন হয়ে থাকে

(বাকী অংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

"তিনি ৭০ বছর বয়সে কতিপয় দরবেশ সাথে নিয়ে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে স্বয়ং জিহাদে শরীক হন।"

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)

কিন্তু সুলতান মাহমূদের রাজনৈতিক বিজয়ের পরিপূর্ণতা এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ও মযবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ যেমন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরীর ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল, ঠিক তেমনিই আবূ মুহাম্মদ চিশতী (র)-এর মিশনের পূর্ণতা সাধন, ইসলামের ব্যাপক ও সাধারণ প্রচার-প্রসার, মযবুত ভিত্তিক ইসলামী কেন্দ্র এবং সততা ও হেদায়াতের প্রতিষ্ঠা উক্ত সিলসিলারই একজন বুযুর্গ আওলিয়াকুল শিরোমণি হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী সিজযী[১] (র)-এর ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছিল।

(পূ. পৃষ্ঠার পর) তবে এর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত মাওলানা জামী "আক্রমণ" দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রমণকে বুঝিয়েছেন এবং তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণকেই সোমনাথ আক্রমণের সমার্থক ভেবেছেন। কেননা সুলতান মাহমূদের একমাত্র সোমনাথ বিজয়ই ভারতবর্ষের বাইরে ব্যাপক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। সোমনাথ আক্রমণের পূর্বেই তিনি ৮বার ভারত আক্রমণ করেন। এর মধ্যে কোন একটিতে (সম্ভবত প্রথম আক্রমণ পরিচালনা কালে) শায়খ আবূ মুহাম্মাদ(র) সুলতান মাহমূদের সঙ্গী ছিলেন।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী(র) স্বীয় জন্মভূমির প্রকৃত নামে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে 'সিজযী' হবেন' কিন্তু লেখকদের ভুলেই হোক কিংবা সাধারণের উচ্চারণদোষে হোক তিনি 'সিঞ্জরী' হয়ে গেছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং কবিতা ও গাঁথা থেকে অবগত হওয়ার যায় যে, প্রথমে 'সিজযীই' লেখা হ'ত এবং বলা হ'ত। 'সিজয' সিজিস্তান-এর দিকে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভূগোলবেত্তাগণ একে সাধারণভাবে খুরসান প্রদেশের অন্তর্গত বলে ধরে নেন। বর্তমানে এর অধিকাংশ এলাকাই ইরানের এবং বাকী অংশ আফগানিস্তানের অন্তর্গত। এই এলাকার রাজধানী ছিল জরন্জ যার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে যাহিদানের নিকটে পাওয়া যায়। এককালে সিজিস্তানের সীমানা গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (আহসানুত্তাকাসীম)

কোন কোন ভূগোলবেত্তার মতে, 'সিজয' সিজিস্তানের অন্তর্গত একটি বিশেষ জায়গার নাম যার দিকেসম্পর্কিত হওয়ার কারণেও একজনকে সিজযী বলা হয়।

প্রাচ্যের খেলাফতের ভৌগোলিক সীমারেখা'র লেখক মি. জি. বি. স্ট্রেঞ্জ ৩০ পৃষ্ঠা জুড়ে সিজিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখা বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে, সিস্তান ফারসী শব্দ. সংগীস্তান থেকে উদ্ভূত। আরবরা তাকে সিজিস্তান বলে। উক্ত এলাকার যমীন নীচুতে এবং হ্রদ জেরাহ নামক জায়গার পাশে ও তার পূর্ব দিকে অবস্থিত। হিলমন্দ নদীসহ যতগুলো নদী উক্ত হ্রদে পতিত হয় এর সবগুলির উৎসমূল এ এলাকাতেই পড়ে।

ফারসী ভাষায় সিস্তানকে 'নিমরোজ' (বা দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র) বলা হয়। সিস্তান খুরাসানের দক্ষিণে অবস্থিত বলে দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্র বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫০৩ ও ৫০৪)।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ (যার মধ্যে তাবাকাতে নাসিরীর লেখক কাযী মিনহাজুদ্দীন 'উছমানী জুনজানীও অন্তর্ভুক্ত–যিনি হযরত খাজা সাহেবের অল্পবয়স্ক সমসাময়িকও ছিলেন)[১] বলেন, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর সেইসব সৈন্যবাহিনীর সাথেই ছিলেন যারা আজমীরের রাজা রায় পাথুরাকে (পৃথ্বিরাজ[২]) পরাজিত করেন এবং ভারতবর্ষ বিজয় সম্পূর্ণ

---

১. কাযী সাহেবের জন্ম ৫৮৯ হিজরীতে হয়েছিল।

২. পৃথ্বিরাজ অথবা রায় পাথুরা (১১৭৭-১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ) সোমেশ্বরের পুত্র ছিলেন– যিনি আজমীরে চৌহান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অরুনা রাজার পুত্র এবং এ বংশেরই প্রখ্যাত শাসক ডোগর রাজা ওরফে দলীল দেবের ভাই ছিলেন। সোমেশ্বরের দিল্লীর তুমার রাজপুত নৃপতির বংশ এবং আজমীরের চৌহান বংশের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল। সোমেশ্বর দিল্লীর শেষ তুমার- রাজ আনন্দ পাল (অনঙ্গ পাল)-এর জামাতা ছিলেন এবং এই সুবাদে পৃথ্বিরাজ দিল্লীর শেষ নৃপতির দৌহিত্র হন। আনন্দ পালের জীবিত কোন পুত্রসন্তান ছিল না বিধায় তিনি পৃথ্বিরাজকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে নৃপতির মৃত্যুর পর পৃথ্বিরাজ স্বাভাবিকভাবেই দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং পৈত্রিক সূত্রে রাজা সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর আজমীরের শাসনভারও লাভ করেন। এভাবেই রাজা পৃথ্বিরাজ রাজপুত রাজাদের দু'টি শক্তিশালী কেন্দ্র দিল্লী ও আজমীরের সিংহাসনের অধিকারী হন। যেহেতু আজমীর ছিল তাঁর জন্মস্থান ও পৈত্রিক আবাসভূমি এবং দাদার সিংহাসনও এখানেই ছিল, তাই ষোল আনা সম্ভাবনা যে, পৃথ্বিরাজ অধিকাংশ সময় আজমীরেই কাটাতেন। আর এ কারণেই সে যুগে আজমীরই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। ব্যক্তিগতভাবে পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত উৎসাহী ও উচ্চাকাংখী বীর বাহাদুর, অদ্বিতীয় তীক্ষ্ণধী রাজপুত্র ছিলেন। অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি বিজয় শিরোপা লাভে সক্ষম হন যা শতাব্দী কাল পর্যন্ত তাঁর নাম ও খ্যাতিকে অম্লান ও উজ্জ্বল রেখেছিল।

কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের মেয়ে সংযুক্তাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে উঠিয়ে আনার কারণে তিনি রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায় কিংবদন্তীর নায়ক হিসাবে উত্তর ভারতের গাথা ও কাব্যে স্থান লাভ করেন যা অদ্যাবধি গীত ও পঠিত হয়ে থাকে। পৃথ্বিরাজ স্বীয় রণনৈপুণ্যে, দৃঢ় চেতনায় এবং বিবিধ বিজয়ের কারণে ভারতবর্ষের শেষ দু'জন বাহাদুর রাজপুত ও শক্তিশালী নৃপতির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য।কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পরাজয় তাঁর মান-মর্যাদা পর্দার অন্তরালে ঠেলে দেয়। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৫৮৭) যখন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন পৃথ্বিরাজ তরাইন (বর্তমানে তেলোণ্ডী) নামক স্থানে যা থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দুরে অবস্থিত–একটি সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর মুকাবিলা করেন এবং সুলতানকে পরাজিত করেন। পরবর্তী বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৫৮৮) সুলতান বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে নব উদ্যমে এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দ্বিতীয় বার আক্রমণ করেন। পৃথ্বিরাজ তিন লাখ ঘোড় সওয়ার এবং তিন হাজার হাতী সহকারে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন। ১৫ জন রাজপুত রাজাও নিজ নিজ বাহিনীসহ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পৃথ্বিরাজ পরাজিত হন এবং বন্দী অবস্থায় নীত ও নিহত হন। এভাবেই রাজপুতদের স্বাধীন সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে। (অধ্যাপক ঈশ্বরী প্রসাদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক থেকে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত)

করেন। এ বিজয়ে তাঁর দু'আ, তাওয়াজ্জুহ ও আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিরাট ভূমিকা ছিল।[১]

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর আক্রমণ পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ের (৫৭৯ হিজরী থেকে ৬০২ হিজরী) প্রথম দিকেই আজমীরে যা সে সময়ে রাজপুত শক্তি ও সাম্রাজ্যের এবং হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার একটি বিরাট কেন্দ্র[২] ছিল, অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যখন মুহাম্মদ ঘোরীর আক্রমণ দ্বারা ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়নি এবং যখন তাঁর আক্রমণ পরিচালনা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে এমন একটি ঘটনার উদ্ভব ঘটে যদ্দারা ভারতবর্ষের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যায়। রাজা পৃথ্বিরাজ কোন একজন মুসলমানকে (সম্ভবত তারই দরবারের সাথে সম্পর্কিত কেউ হবেন) কষ্ট ও বিপদের মধ্যে ফেলেন। এর প্রতিকার চেয়ে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) পৃথ্বিরাজকে একটি পত্র লিখেন। পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত গর্বভরে অবমাননাকর ভাষায় ওই পত্রের জবাবে বলেন, 'এই লোকটি এখানে আসার পর এমন বড় বড় কথা বলে যা কেউ কখনও বলেনি এবং শোনেও নি।' হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) ঐ জবাব শুনে বলেন, 'আমি পৃথ্বিরাজকে জীবিত বন্দী করে মুহাম্মদ ঘোরীর হাতে তুলে দিলাম।' এর পর পরই মুহাম্মদ ঘোরী হামলা করেন। পৃথ্বিরাজ মুকাবিলা করেন এবং পরাজিত হন।[৩]

যা হোক, ঘটনার বিবরণে যতটুকু জানা যায়, তাতে কোনই সন্দেহ নেই যে, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) মুহাম্মদ ঘোরীর হামলার মধ্যবর্তী সময়ে এবং ভারতবর্ষে ইসলামী সাম্রাজ্য সাধারণভাবে ও সুদৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বেই প্রাচীন ভারতবর্ষের বিরাট রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আজমীরকেই আবাসস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর অটুট সংকল্প, উচ্চ মনোবল ও ঈমানী সাহসিকতার এমন একটি উজ্জ্বল ঘটনা যার নজীর শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা ও বিশ্ববিজেতাদের জীবনকথায় পাওয়া যাবে। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য,

---

১. তাবাকাতে নাসীরী, পৃষ্ঠা ৪০; তারীখে ফিরিশতা, ৫৭ পৃষ্ঠা; মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ, ৫০ পৃষ্ঠা।

২. আজমীর থেকে ৭ মাইল উত্তরে পুশকর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি যার দর্শন উপলক্ষে দূর-দূরাজ এলাকা থেকে লোক সমাগম ঘটত। এর ঝিল (হ্রদ ও পুকুর) ধর্মীয় পবিত্র বস্তুর মর্যাদা লাভ করেছিল। একমাত্র মানস সরোবরই তার সমপর্যায় ও সমমর্যাদার দাবি করতে পারত। পুশকরের ঝিল সম্পর্কে সাধারণ্যে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রচলিত যে, ব্রহ্মা সেখানে ধ্যানস্থ হন এবং স্বরস্বতী নিজস্ব পাঁচটি ধারা দ্বারা প্রকটিত হন। (আজমীর গেজেটিয়ার, পৃষ্ঠা-১৮)

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭; মাআছিরুল কিরাম, পৃষ্ঠা ৭;

ঐকান্তিকতা, আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা, তাকওয়া, পরহেযগারী ও ত্যাগ স্বীকারের কারণেই, যে ভূখণ্ড ছিল হাযার হাযার বছর ধরে সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মের প্রকৃত রূপ ও পরিচিতি থেকে বঞ্চিত, তাওহীদের বজ্রকণ্ঠ থেকে ছিল বধির ও অজ্ঞ, সেই ভূখণ্ডই 'উলামায়ে কিরামের আবাসভূমি এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনী পরিপূর্ণতার বিশ্বস্ত আমানতদার ও সংরক্ষক হয়ে পড়ে। তার আকাশ-বাতাস আযানের শব্দে অনুরণিত আর পর্বতমালা ও গিরি-কন্দর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং শহর-বন্দরগুলি আল্লাহ্র কালাম ও রসূল পাক (স)-এর বাণীতে গুঞ্জরিত ও মুখরিত হয়ে ওঠে।

সিয়ারুল আওলিয়ার গ্রন্থকার কী সুন্দর করেই না লিখেছেন–

"ভারতবর্ষ নামক দেশটির শেষ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকের রাজত্ব ছিল। খোদাদ্রোহীরা তারস্বরে 'আনা রাব্বুকুমু'ল- আ'লা' (আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) আওয়াজ হাঁকছিল। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ইট, পাথর, গাছ, পশু, গাভী ও গোবরকে প্রণতি জানাচ্ছিল। কুফর ও অন্ধকার দ্বারা মানুষের অন্তর-মন ছিল আচ্ছন্ন ও তালাবদ্ধ। সবাই ছিল দীন ও শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অনীহ, অসতর্ক এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহী রসূল (সা) সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর। এরা কেউ কেবলা চিনত না, 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজও কেউ শোনেনি। বিশ্বাসীদের সূর্য হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর কদম মুবারক এদেশের মাটিতে পড়া মাত্রই রাষ্ট্রের নিশ্ছিদ্র অন্ধকাররাশি ইসলামের সুশোভিত আলোকমালায় রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়ে গেল। একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রভাবে, যেখানে ক'দিন আগেও শিরকের কালো প্রতীক বিরাজ করত, সেখানে মসজিদ, মিহরাব ও মিম্বর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। যে আসমান পৌত্তলিকতা ও শিরকের বিষবাষ্পে ছিল ভরপুর সেখানে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। এদেশে যাঁরাই ঈমান ও ইসলামের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন, শুধু তাঁরাই নন বরং তাঁদের সন্তান-সন্ততি, অধঃস্তন বংশধরগণ সবাই তাঁরই 'আমলনামার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যতই বিস্তৃতি হতে থাকবে, তার ছওয়াব শায়খুল ইসলাম খাজা মু'ঈনুদ্দীন হাসান সিজ্যী (র)-এর রূহ মুবারকে ততই পৌঁছুতে থাকবে।"[১]

এভাবে ভারতবর্ষের বুকে আল্লাহ্র নাম যা কিছু নেওয়া হয়েছে এবং ইসলামের জন্য যা কিছু কাজ করা হয়েছে তার সবই চিশতীদের এবং তাদের একনিষ্ঠ ও উচ্চ দৃঢ় মনোবলের অধিকারী উক্ত সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর সৎকর্মশীলতা ও কার্যকলাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭;

করবার যোগ্য। আর এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ উপমহাদেশে চিশতীয়া সিলসিলার দাবি ও অধিকার অত্যন্ত প্রাচীন। মাওলানা গুলাম 'আলী আযাদ ঠিকই লিখেছেনঃ

"এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, চিশতীয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ ও মনীষীদের ভারতীয় উপমহাদেশের উপর চিরন্তন দাবি ও অধিকার রয়েছে।[১] সিয়া'রুল-আকতাব গ্রন্থের লেখকও ঠিকই বলেছেন ঃ

"এদের (চিশতীয়া সিলসিলার মহান সাধকদের) পদধূলির বরকতেই ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।"[২]

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর জীবদ্দশায়ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র আজমীর থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং আজমীর তার গুরুত্ব অনেকটা হারিয়ে ফেলে। খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবেতদীয় প্রধান খলীফা খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)কে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত করেন। আজমীরেই তিনি তাঁর বাকী জীবন ইসলামের প্রচার, ধর্মোপদেশ দান, তা'লীম ও তরবিয়ত এবং সত্যের সাধনায় নিমগ্ন থাকার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেন। কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎসের মধ্যেই এসব প্রচার-প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের পরিণতি বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে এতটুকুই বলা হয় থাকে যে, বিরাট ও বিপুল সংখ্যক আল্লাহ্ বান্দা তাঁর হাতে ঈমান ও ইহসানের অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিল এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। আবুল ফযল 'আঈন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে বলেন

"(তিনি) আজমীরেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রদীপ শিখা উজ্জ্বলতররূপে প্রজ্বলিত করেন। তাঁর পবিত্র সত্তায় মুগ্ধ হয়ে লোকে দলে দলে ঈমানরূপ সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিল।"[৩]

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল যাবত ধর্মোপদেশ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রচার, ইসলামের মুবাল্লিগ ও সূফী-সাধকদের তা'লীম ও তরবিয়ত এবং সত্যের অনুসরণে অত্যন্ত কায়মনে লিপ্ত থেকে ৯০ বছর বয়সে ৬২৭ হিজরীতে[৪] সেই

---

১. মাআছিরুল কিরাম, পৃষ্ঠা ৭;

২. সিয়ারুল আকতাব, পৃ. ১০১;

৩. আঈন-ই আকবরী, স্যার সায়্যিদ সংস্করণ, পৃ. ২৭০;

৪. মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে তিনটি সনের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন ৬২৭, ৬৩২ ও ৬৩৩ হিজরী। সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থের লেখক আফতাব মূলক হিন্দ-এর মাধ্যমে মৃত্যু সন ৬৩৩ হিজরী বের করেন। খাযীনাতুল আসফিয়ার লেখক এটাকেই মৃত্যু সন হিসাবে উল্লেখ করেন।

মুহূর্তে ইন্তেকাল করেন যখন ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁর নিজ হাতে লাগানো সাধের চারাটি ফলে-ফুলে সুশোভিত এবং রাজধানী দিল্লীতে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত ও দীক্ষাপ্রাপ্ত সে যুগের মনীষী হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (র) ধর্মোপদেশ ও হেদায়েতের কাজে অত্যন্ত সংগ্রামরত এবং কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন। অন্যদিকে তাঁরই একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত অন্যতম খাদেম সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপকভিত্তিক প্রসারে, তার ভিত্তি সুদৃঢ়করণে, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও প্রতিপালনে গভীরভাবে মশগুল।

খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)

খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) ক্ষুদ্র শহর আওশ'[1] নামক স্থানে (মাউরাউন্নাহার) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। মা-ই তাঁকে লালন-পালন করেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মকতবে ভর্তি হন এবং মাওলানা আবু হাফাস আওশী (র)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তরীকতের সেই মহান ও শ্রেষ্ঠ বুযুর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ ঘটে যাঁর নেতৃত্বে তিনি আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছুতে সক্ষম হন এবং যাঁর হাতে ও যাঁর সঙ্গে শরীক হয়ে ভারতবর্ষে ইসলামের আবে হায়াত জারী করেন। ফকীহ্ আবুললায়েছ সমরকন্দী (র)-এর ঐতিহাসিক ও বরকতময় মসজিদে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতনামা 'উলামায়ে কিরাম ও তরীকতের সাধকদের উপস্থিতিতেই তিনি খিলাফতের খেরকা লাভে ধন্য হন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং স্বীয় পীর ও মুরশিদের নির্দেশ ও হেদায়েত মুতাবিক দিল্লীকেই স্থায়ী ঠিকানারূপে মনোনীত করেন যা উর্বর ও প্রসারমান ইসলামী সালতানাতের রাজধানী ছিল এবং যা একদিকে উচ্চ মনোবলসম্পন্ন মুসলিম বাদশাহদের আনুকূল্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং জ্ঞানী-গুণীজনের মর্যাদা ও কদর দান, অন্যদিকে তাতারীদের হামলার ফলে উলামায়ে কিরাম, ভদ্র ও অভিজাত মহল এবং বিজ্ঞ-সুধী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুর্ণতাপ্রাপ্ত ওলীয়ে কামিলদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে তখন দিল্লীতে মুসলিম জাহানের সম্পদ ও প্রতিভা স্থানান্তরিত হচ্ছিল।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ তাঁকে যথাযোগ্য কদর ও মর্যাদা দান করেন। কিন্তু তিনি শাহী দরবারের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখা পসন্দ করলেন না। সুলতানের তরফ থেকে পেশকৃত হাদিয়া-তোহফা কিংবা কোনরূপ জায়গীর

---

১. ইয়াকূত মু'জামুল বুলদান নামক গ্রন্থে বলেন ঃ আওশ ফারগানা রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রধান শহরের নাম।

ও ভূ-সম্পত্তি কবুল করা থেকেও বিরত রইলেন। প্রথমে তিনি কিলোখড়ি, পরে মালিক 'ইয্যুদ্দীনের মসজিদের নিকট ফকীর ও দরবেশের জীবন যাপন শুরু করেন।[১] সুলতান বরাবরের মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর দরবারে হাযিরা দিতে থাকেন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষাবধি খাজা বখতিয়ার কাকী (র)-এর দরবারে শহরবাসী লোকজনের আনাগোনা এমনভাবে বেড়ে যায় যে, সে যুগের শায়খুল ইসলাম শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (র)-এর মনেও তাঁর সম্পর্কে কিছুটা অসন্তুষ্টি ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী স্বীয় খলীফার সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে দিল্লী এলে শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা -যিনি খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর অত্যন্ত পুরানো দোস্ত ছিলেন- বখতিয়ার কাকী সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এতে হযরত খাজা চিশতী (র) স্বীয় ভক্ত মুরীদকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

"বাবা বখতিয়ার ! এত সত্বর তুমি মশহূর হয়ে গেছ যে, আল্লাহ্র বান্দাদের মনে তোমার সম্পর্কে ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তুমি এ জায়গা ছাড় এবং আজমীরে এস। তুমি সেখানেই বসবাস করবে এবং তোমার খেদমতের জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত থাকব।"[২]

হযরত খাজা এমন একটি কথা উচ্চারণ করলেন যা তাঁর মত উচ্চ ও মহান মর্যাদার অধিকারী শায়খের পক্ষেই সম্ভব-যিনি ইখলাস ও রব্বানী ভাবধারার পূর্ণতম মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। ন্যায়, সত্য ও আল্লাহ্র পথের যিনি পথিক, আল্লাহ্র এক নগণ্য সৃষ্টির অভিযোগ ও হা-হুতাশকেও যেক্ষেত্রে তিনি গুনাহ মনে করেন, সেক্ষেত্রে শায়খুল ইসলামের অসন্তুষ্টি ও অভিযোগের কথা তো বলাই বাহুল্য। উপরন্তু ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে বিশৃংখলা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করাকে তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। সূক্ষ্মতর উপায়ে আপন মুরীদকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, যদি এখানকার জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধজনেরা তোমার সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে থাকে তবে আমি তো জ্ঞাত আছি। এখানে কে খাদেম আর কে মাখদূম, কে শায়খ (পীর) আর কে মুরীদ সে প্রশ্ন অবান্তর। ওখানে (আজমীরে) তুমি মাখদূমের মত থাকবে আর আমি খাদেম হিসাবে তোমার খেদমতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব। এতে হযরত খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) সে জওয়াবই দিয়েছিলেন যা দেওয়া তাঁর পক্ষেই ছিল সম্ভব ও স্বাভাবিক। তিনি নিবেদন করলেন ঃ

"মাখদুম তো বহুত দূরের কথা- আমি আপনার সামনে খাদেমের অধিকার নিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তো রাখি না- বসা তো আরও অসম্ভব ও অকল্পনীয়।"[৩]

---

১. তারীখে ফিরিশতা, ৭২০ পৃ.
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫৪;
৩. ঐ. পৃ. ৫৪;

অবশেষে শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (র)-কে আজমীর গমনের নির্দেশ দেন। বিশ্বস্ত মুরীদও সাথে সাথে কোনরূপ আপত্তি ও প্রতিবাদ ছাড়াই মুরশিদের আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু যখন শহরের বাইরে পা রাখেন তখনই শায়খ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)আপন মুরীদের অসম্ভব ও অস্বাভাবিক রকমের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি এও বুঝতে পারেন যে, এ জনপ্রিয়তা আল্লাহ্র তরফ থেকে এবং এতে প্রবৃত্তিজাত ও নিজস্ব সৃষ্টিজাত কোন বিষয়ই নেই। সুযোগ্য মুরীদ যে সমস্ত দিল্লীবাসীর মন ইতিমধ্যেই প্রেমবিমুগ্ধ ও আবেশবিহ্বল করে ফেলেছে এটা তিনি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতার ভাষায় ঃ

"খাজা কুতবুদ্দীন (র) স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের সাথে আজমীরের দিকে রওয়ানা হন। এ সংবাদ দিল্লীবাসীদের কানে পৌঁছুতেই শহরে একটা হাঙ্গামা ও গোলযোগের উপক্রম হয়। সমস্ত শহরবাসী, এমন কি সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশও শহর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অনুগামী হন। যেখানেই খাজা কুতবুদ্দীনের কদম মুবারক পড়ছিল সেখানকার পদস্পর্শিত ধুলিকে লোকেরা তাবাররুক ভেবে সাথে সাথেই উঠিয়ে নিচ্ছিল আর অস্থির ও বিহ্বলচিত্তে কান্নাকাটি করছিল।"[1]

একটি মাত্র মন-মানসকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং একটি সামান্যতম কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে আল্লাহ্র লাখো বান্দার মন-মানসকে ব্যথাতুর ও বেদনাক্রান্ত করে তোলা মোটেই সমীচীন ছিল না। তাই মুরশিদ আপন মুরীদকে আজমীর নিয়ে যাবার ইরাদা পরিত্যাগ করে বল্লেন ঃ

"বাবা বখতিয়ার! তুমি এখানেই থাক। কেননা তোমার বাইরে যাবার কথা জেনে আল্লাহ্র এতগুলো বান্দা অত্যন্ত ব্যথাতুর ও বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আমি এটাকে জায়েয মনে করি না যে, এতগুলো লোকের অন্তর-জ্বালাকে বাড়িয়ে তুলি। যাও, এ শহরকে আমি তোমার আশ্রয়ে রেখে গেলাম।"[2]

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ–যাঁর রাজধানী এমন একটি পবিত্র সত্তার উপস্থিতি ও অবস্থিতি থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল –উপরিউক্ত ঘটনার ফলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর শুকরিয়া আদায় করেন। খাজা কুতবুদ্দীন কাকী (র) শহরে প্রত্যাগমন করেন আর ওদিকে খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) আজমীরের পথে রওয়ানা হন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫৫ পৃ.

২. আখবারুল আখয়ার, পৃ. ২৬;

হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) দিল্লী ফিরে এসেই স্বীয় চাটাইয়ের আসনে বসে জোরেশোরে ধর্মীয় উপদেশ, শিক্ষা ও তদনুযায়ী বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। তিনি শুধু সরকার ও শাহী দরবারের সাথে সম্পর্কই ছিন্ন করেন নি, বরং এটাকেই জীবনের লক্ষ্য ও মূলনীতি বানিয়ে নেন। এমনকি স্বীয় সিলসিলাভুক্ত সবার জন্যই এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, দারিদ্র্য বরণ ও ধনাঢ্যতা বর্জনের সাথে সাথে শাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করেই নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। এরূপ সংস্রবহীনতা ও বর্জন নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশিষ্ট ও সাধারণ বাদশাহ ও গরীব সকলেই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয় এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষের আনাগোনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

"সমগ্র দুনিয়া, অভিজাত-অনভিজাত, বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট সবাই ছিল তাঁর দু'আ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত ও পাগলপারা।"[১]

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ সপ্তাহে দু'বার তাঁর দরবারে হাযির হতেন এবং তাঁর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। দিল্লীতে যা তখন শুধু ভারতবর্ষের রাজধানীই ছিলনা বরং মুসলিম জাহানের নবতর শক্তি, ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ও সংস্কারের নতুন কেন্দ্র এবং বিশিষ্ট 'উলামায়ে কিরাম, শিক্ষকমণ্ডলী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অভিজাত মহল, তরীকতের পথ প্রদর্শক ও সিলসিলাভুক্ত অন্যান্য বুযুর্গ এবং ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সন্তান ও প্রতিভাধরদের সমাবেশস্থল ছিল—সেখানে তরীকতের প্রচার ও প্রসার, মানুষের অন্তর-মানসকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং নবোত্থিত ইসলামী সাম্রাজ্যের সঠিক নৈতিক নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, দারিদ্র্য অনুসরণ, ধনাঢ্যতা বর্জনের নীতিকে এতটুকু কালিমাযুক্ত ও ধূলা-মলিন না করে আঞ্জাম দেওয়াটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এজন্য প্রয়োজন ছিল পর্বতপ্রমাণ ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং বাতাসের মত ক্ষিপ্র প্রবাহমানতা যাতে গায়ে আঁচড়টিও না লাগে। হযরত খাজা সাহেব (র) অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে নাযুক ও কঠিন এ দায়িত্বটি আঞ্জাম দেন। একাজের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় পাননি। স্বীয় শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর পর বড় জোর চার কি পাঁচ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।[২] কিন্তু তাঁর বদৌলতে ভারতবর্ষে চিশতীয়া সিলসিলার বুনিয়াদই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং যে সুমহান ও উচ্চ লক্ষ্যের জন্য হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া;

২. যদি খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর মৃত্যু সন ৬২৭ হিজরী মেনেও নেয়া যায় তবে খাজা কুত্‌বুদ্দীন (র) তাঁর ইন্তিকালের পর মাত্র ৬ বছর বেঁচেছিলেন।

চিশতী (র) ভারতবর্ষকে নিজের অবস্থানস্থল ও কর্মক্ষেত্ররূপে বাছাই করেছিলেন তা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সার্থকতা লাভ করে।

তখন তাঁর বয়স ৫০ বছর কি তার কিছু বেশী হবে– ঐশী প্রেম ও মুহব্বতের যে হুতাশন তিনি ধৈর্য ও স্থৈর্যের ভিতর বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন এবং যে আগুন তিনি গোটা সৃষ্টির বাস্তব প্রশিক্ষণ ও হেদায়েতের মহত্তর লক্ষ্য ও কল্যাণ দ্বারা লিপিষ্ট করে রেখেছিলেন– তাই হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে– ছাপিয়ে ওঠে সব কিছুর উপর :

صدائے تیغ تو آمد بیزم زنده دلاں
کدام که درد ذوق این سرود نماند

একবার শায়খ 'আলী সাকাজ্জীর'[১] খানকাহ্‌তে 'সামা'র মজলিস ছিল অত্যন্ত সরগরম। এক কাওয়াল কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

کشتگان خنجر تسلیم را ۔ هر زمان از غیب جانے دیگراست

এতে খাজা কুতুবুদ্দীনের উন্মত্ততা ও মুমূর্ষুপ্রায় অবস্থা দেখা দেয়। খানকাহ থেকে আবাসস্থল পর্যন্ত কোনক্রমে আসেন, কিন্তু মত্ততা ও বেহুঁশী অবস্থা কাটেনি। কিছুটা হুঁশ ফিরতেই তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন। আদেশ মাত্রই তা পালন করা হয়। এভাবেই চার রাত্র দিন একাদিক্রমে তিনি বেহুঁশ প্রায় অবস্থায় কাটান। কিন্তু যখনই সালাতের ওয়াক্ত এসে যেত তখনই তিনি চেতনা ফিরে পেতেন। সালাত আদায় করতেন। অতঃপর পুনরায় উক্ত কবিতা আবৃত্তির নির্দেশ দিতেন। আবৃত্তি করা হত, ফলে তিনি পুনরায় বেহুঁশী অবস্থায় চলে যেতেন। পঞ্চম রাত্রিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২] এ ঘটনা ৬৩৩ হিজরীর।[৩]

ইন্তিকালের আগে 'ঈদের দিন তিনি 'ঈদগাহ্ থেকে ঘরের দিকে ফিরছিলেন। পথে তাঁকে এমন একটি জায়গা অতিক্রম করতে হয় যেখানে কোন গ্রাম কিংবা বসতি ছিল না। খাজা কুত্‌বুদ্দীন সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাটান। জনৈক খাদেম আরয করল, "আজ 'ঈদের দিন। উপরন্তু সবাই আপনার জন্য অপেক্ষমান, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" "مرا ازیں زمین بوئے ولها می آید" "আমার এখান থেকে অন্তরের খোশবু আসছে।" পরে কোন এক সময় উক্ত যমীনের মালিককে ডেকে নিজস্ব অর্থ দ্বারা

১. কতক বর্ণনাতে 'সিজযী' লিখিত পাওয়া যায়।

২. সিয়ারুল আওলিয়া বর্ণনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)।

৩. কতক বর্ণনায় ৬৩৩ হিজরীর পরিবর্তে ৬৩৪ হিজরী পাওয়া যায়।

তা খরিদ করেন এবং নিজের দাফনের জন্য সে যমীনটুকুই নির্বাচন করেন। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর খলীফার সংখ্যা (যাঁদের নাম আওলিয়া' কিরামের জীবনীগ্রন্থে বিদ্যমান) নয় কিংবা দশজনের কম ছিল না। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করা, আর জারিকৃত কাজগুলি অব্যাহত রাখা, তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের পরিপূর্ণতা সাধন ও প্রসারের সৌভাগ্য হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-ই লাভ করেছিলেন।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)

যেমনিভাবে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) ভারতবর্ষের বুকে চিশতীয়া সিলসিলার ভিত্তি স্থাপনকারী ও প্রতিষ্ঠাতা, তেমনি হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর এ সিলসিলার মুজাদ্দিদ ও দ্বিতীয় আদম। তাঁরই দু'জন খলীফা সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন দেহলভী (র) এবং হযরত শায়খ 'আলাউদ্দীন আলী সাবির পীরানে কলীরী (র)-এর মাধ্যমে এই সিলসিলা ভারতবর্ষের বুকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এঁদের খলীফা ও সিলসিলাভুক্ত অন্যান্য লোকদের দ্বারা অদ্যাবধি তা সঞ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

خم و خمخانه بامهر و نشان است

"শরাব ও শরাবখানা প্রতিষ্ঠিত ও চিহ্নিতাবস্থায় বিরাজমান রয়েছে।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর প্রকৃত নাম মাস'উদ। উপাধি ছিল ফরীদুদ্দীন। সাধারণভাবে 'গঞ্জে শকর' উপাধিতেই তিনি সারা দুনিয়ায় মশহূর হয়ে আছেন।[২] তিনি হযরত 'ওমর ফারূক (র)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ কাযী শু'আয়ব তাতারী হামলা ও গোলযোগের কারণে কাবুল থেকে লাহোরে আগমন করেন। কিছুকাল কাসূর নামক স্থানেও অবস্থান করেন এবং কাহীনওয়াল শহরের কাযীর পদ ও জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখানে ৫৬৯ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি মুলতান সফর করেন (যা সে সময় ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল)। শহরের শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেন। মাওলানা মিনহাজুদ্দীন তিরমিযীর নিকট ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 'আন্নাফে' পড়েন। এখানেই

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, বর্ণনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র), পৃষ্ঠা, ৫৫, বর্তমানে জায়গাটি হযরত কুতুবুদ্দীন (র)-এর নামে প্রসিদ্ধ।

২. এ উপাধির প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত বিধায় আমরা কিছু বলতে অক্ষম।

৫৮৪ হিজরীতে হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভ ঘটে এবং পরে তাঁরই হাতে বায়'আত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেন। শায়খ ফরীদুদ্দীন(র) খাজা কাকী (র)-এর ব্যক্তিত্বে ও সান্নিধ্যলাভে এতই মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন যে, শিক্ষালাভের সকল পাট চুকিয়েও তিনি স্বীয় মুরশিদের সাহচর্যে কাল কাটাবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ওলীয়ে কামিল হযরত শায়খ (র) এথেকে তাকে নিবৃত্ত করেন এবং পড়াশোনা সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন।[১]

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের খেদমতে দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হন। শায়খ (র) তাঁর অবস্থানের জন্য গযনী দরজার সন্নিকটে একটি জায়গা নির্বাচিত করেন এবং সেখানেই তিনি রিয়াযত ও মুজাহাদায় (কঠোর আত্মিক সাধনা) নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সলূক পরিপূর্ণতার পর তিনি খেলাফত লাভে ধন্য হন এবং শায়খ (র)-এর এজাযতে হাঁসিতে অবস্থান গ্রহণ করেন যা তাঁরই একনিষ্ঠ একজন ভক্ত (যিনি পরে তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফাদের মধ্যে পরিগণিত হন) শায়খ জামালুদ্দীন খতীবে হাঁসির আবাসভূমি ছিল। শায়খের ইন্তিকালের মুহূর্তে তিনি হাঁসিতে ছিলেন। ইন্তিকালের তৃতীয় দিনে তিনি দিল্লীতে আসেন। শায়খ (র)-এর মাযারে ফাতেহা পড়েন। কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরী (র) শায়খ খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী -এর ওসিয়ত মুতাবিক তাঁর প্রদত্ত খিরকা ও অন্যান্য আমানত তাঁকে সোপর্দ করেন। এটা ছিল খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-কে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যাবার সুস্পষ্ট ইংগিত। দু'রাকআত সালাত আদায় করে তিনি খিরকা পরিধান করেন এবং স্বীয় শায়খ খাজা কাকী (র)-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

দিল্লী আসার এবং শায়খ হযরত খাজা কুতবুদ্দীন কাকী (র)-এর স্থলাভিষিক্ত হবার তৃতীয় দিনে সরহিঙ্গা নামীয় তাঁরই একজন পুরনো বন্ধু ও ভক্ত হযরত গঞ্জে শকর (র) কে দেখার প্রবল আগ্রহে দিল্লী আসেন। খাদেমরা তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ভক্ত ও খাদেমদের ভীড়ে উক্ত দরবেশ শায়খ (র)-এর মোলাকাতের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হন। অগত্যা অপেক্ষায় থাকেন কবে তিনি বাইরে আসেন। একদিন হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র) বেরিয়ে আসতেই দরবেশ তাঁর পায়ের উপর পড়ে যান এবং কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, "যতদিন আপনি হাঁসিতে ছিলেন ততদিন অতি সহজেই এবং বিনা বাধায় আপনার সাক্ষাত

১. রাহাতুল কুলুব নামক গ্রন্থে–যা তাঁরই মালফুজাতের সংকলন– এ সফরের ও অন্যান্য ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। যেহেতু উক্ত কিতাব নির্ভরযোগ্য নয় বিধায় তার উপর নির্ভর করা হয়নি। অপর কোন কোন পুস্তকে আরও বিস্তারিত মিলবে।

লাভে ধন্য হতাম। এখানে আমাদের মত গরীবদের পক্ষে আপনার সাক্ষাত লাভ মোটেই সম্ভব নয়।" শায়খ (র) একথায় অত্যন্ত ব্যথা পান এবং বুঝতে পারেন যে, দিল্লীতে তাঁর নিজের আন্তরিক শান্তি লাভের এবং সর্বসাধারণ ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে তাঁর দেখা-সাক্ষাত লাভের অবাধ সুযোগ নেই। তিনি তখনই বন্ধু-বান্ধবদের বললেন, "আমি হাঁসি যাব।" উপস্থিত সবাই আরয করল, "শায়খ কুত্‌বুদ্দীন (র) তো আপনাকে এখানেই বসিয়ে গেছেন। এখন আপনি আবার কোথায় যাবেন?" উত্তরে হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) জানান, "শায়খ (র) তাঁর আমানত সোপর্দ করে দিয়েছেন। এখন আমি শহরে থাকি আর প্রান্তরে থাকি কিংবা জঙ্গলে যাই -- তা আমার সাথেই থাকবে।"[১]

আবাসস্থল হিসাবে হাঁসিকে তিনি বেছে নেন যেন শান্তিতে থাকতে পারেন এবং থাকতে পারেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। এখানেও খাজা কুত্‌বুদ্দীন (র)-এর একজন মুরীদ মাওলানা নূর তুর্কের কারণে [যিনি হাঁসির অধিবাসীদেরকে তাঁর (হযরত গঞ্জে শকরের) মর্তবা ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করিয়ে দেন] তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বিপুল জনসমাগম হতে থাকে। অবশেষে তিনি তাঁর পুরনো আবাসস্থল কাহীনওয়ালে গমন করেন। কাহীনওয়াল ছিল মুলতানের সন্নিকটে। তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদার কথা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে গেছে তখন। তিনি আজুদহনকে[২] অবস্থানস্থল হিসাবে নির্বাচন করেন এবং বলেন, যেহেতু আজুদহনের অধিবাসীবৃন্দ জাহিল ও অজ্ঞ এবং জায়গাটিও অখ্যাত ও অপরিচিত, তাই এখানে ঝামেলা কম হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছুবার স্বল্পকালের ভেতরই তিনি মশহূর হয়ে ওঠেন এবং চতুর্দিক থেকে লোকের ভীড় বাড়তে শুরু করে। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর খ্যাতি ও মর্যাদার সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে এবং তার আলোকচ্ছটা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত। অল্পদিনের ভেতরই লোক সমাগম বেড়ে যায় এবং আগত লোকের আনাগোনা বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। ফলে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা খোলা থাকত।

এখানে অবস্থানকালে বেশ কিছুদিন টানাপোড়েন, দুঃখ-কষ্ট ও কঠোর দারিদ্র্য দশায় তাঁর জীবন কাটে। পীলু গাছের ফল ছিঁড়ে আনা হ'ত এবং এতে কিছু লবণ ছিটিয়ে তাই গরীব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত, আর নিজেও মেহমান ও সমস্ত খাদেমদের নিয়ে তাই খেতেন। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতার অবস্থা এমনি ছিল যে, একবার তিনি সিয়াম শেষে ইফতারের উদ্দেশ্যে এক লোকমা মুখে উঠিয়েই বললেন, এর ভেতর

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৭২;

২. আজুদহনকে বর্তমানে পাকপত্তন বলা হয়। বর্তমানে এটি মন্টোগোমারী জেলার একটি ছোট শহর (পাকিস্তান)।

নীতিহীনতার গন্ধ পাচ্ছি। খাদেম উত্তরে জানায়, লবণ ছিল না। তাই একটু ধার নিয়ে এতে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তুমি নীতিহীন কাজ করেছ, আমার জন্য এরূপ খাবার শোভা পায় না।[১] কিছু কাল পর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রাত-দিন চূলা জ্বলতে থাকত এবং অর্ধেক রাত অবধি খানাপিনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকত। সেখানে যেই আসত সেই তার খাবার প্রস্তুত পেত।[২] তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা ও অন্তরের প্রীতি সবার প্রতিই ছিল এক রকম। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বলেন, আশ্চর্য ছিল তাঁর শক্তি, আর এমন আশ্চর্য ছিল তাঁর জীবন-ধারণ পদ্ধতি যা বরদাশত করা অন্য কারো পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তিনি নবাগত এবং বহু বছর যাবত পরিচিত ও একান্ত সান্নিধ্যে বসবাসকারী সবার সাথে একই রূপ খোশমেযাজ, দয়া, প্রীতি ও একাগ্রতার সাথে মিশতেন। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত খাদেম আমিই ছিলাম। তিনি যা বলতেন, আমাকেই বলতেন। তাঁর ঘরে বাইরে তথা সদরে-অন্দরে ছিল একই অবস্থা। তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের মাঝে কোন বিরোধ বা পার্থক্য ছিল না। বছরের পর বছর তাঁর খেদমত ও সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর-বিরোধিতা লক্ষ্য করিনি।[৩]

একবার সুলতান নাসীরুদ্দীন মাহমূদ সমগ্র সেনাবাহিনী সমেত আউচ ও মুলতান সফরে আসেন এবং খাজা (র)-এর দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে আজুদহনে হাযির হন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেন, "ভীড় ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অবশেষে খাদেমকূল একটি কৌশল অবলম্বন করল। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর একটি পিরহান (জামা)-এর আস্তিন প্রাসাদের বাইরে টাঙিয়ে দেওয়া হল। সেনাবাহিনী আসত এবং তাতে চুমু দিয়ে চলে যেত। শেষ পর্যন্ত আস্তিন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন এবং খাদেমবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার চারিপাশে বেষ্টনী তৈরি কর যেন কোন দর্শনপ্রার্থী এর ভেতর না আসতে পারে। লোকেরা আসত এবং বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যেত। আকস্মিকভাবে একজন বৃদ্ধ ফরাশ বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে এসে পড়ে এবং শায়খ (র)-এর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। সে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় এবং বলে, শায়খ ফরীদ! শ্রান্ত হয়ে গেছ। আল্লাহ্ পাকের দেওয়া এ পুরস্কারের আরও বেশী শুকরিয়া আদায় কর। শায়খ (র) একথা শুনে জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন এবং উক্ত ফরাশকে অত্যন্ত খাতির-সম্মান করেন।"[৪]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৬৫;
২. ঐ, পৃ. ৬৪;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৬৫;
৪. ঐ, পৃ ৭৯;

একবার সুলতান নাসীরুদ্দীন নিজেই শায়খ (র)-এর দরবারে হাযির হওয়ার সংকল্প নেন। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি গিয়াছুদ্দীন বলবন, যিনি সুলতানের সাথেই ছিলেন, আরয করলেন ঃ সাথে বিরাট সৈন্যবাহিনী, আর এদিকে আজুদহন পানি ও ঘাস-পাতাহীন শুষ্ক ও রুক্ষ জায়গা। আপনার নির্দেশ হলে এ বান্দাহ্ নিজে গিয়ে জাহাঁপনার পক্ষ থেকে ওযরখাহী করে আসত ও হাদিয়া- তোহ্ফা পেশ করত। অতঃপর কিছু নগদ অর্থ ও চারটি গ্রাম জায়গীর প্রদানের শাহী ফরমান নিয়ে বলবন খাজা (র)-এর দরবারে হাযির হন এবং অর্থ ও ফরমান শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর সামনে পেশ করেন। তখন শায়খ বলেন, "এটা কি?" গিয়াছুদ্দীন বলবন জানান, এতে কিছু নগদ অর্থ-কড়ি আছে আর এর সাথে আছে হুযুরকে প্রদত্ত জায়গীরের শাহী ফরমান। শায়খ মুচকি হেসে উত্তর দেন, "নগদ টাকা-কড়ি আমাকে দিয়ে দাও আর শাহী ফরমান ফিরিয়ে নাও। ওর গ্রাহক অনেক মিলবে।" একথা বলেই তিনি নগদ টাকা-কড়ি তখনই উপস্থিত দরবেশদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।[১]

সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবন হযরত শায়খ (র)-এর সাথে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। দিল্লীর সালতানাত লাভ করাকেও তিনি হযরত (র)-এর দু'আ', প্রেম ও আন্তরিক মুহব্বতের পরিণতি মনে করতেন এবং তাঁর খাদেমবৃন্দের খেদমত করাকেও তিনি নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতেন। হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) একবার এক ব্যক্তির অনুরোধ-উপরোধে একান্ত বাধ্য হয়ে বাদশাহ্‌র নিকট তাঁর সম্পর্কে একটি সুপারিশ পত্র লিখে দেন যা একই সাথে সুপারিশ ও অমুখাপেক্ষিতার আশ্চর্য এক সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ছিল। তিনি লিখেন ঃ

"আমি এ ব্যক্তির বিষয় আল্লাহ পাক এবং পরে আপনার সামনে পেশ করছি। যদি আপনি তাকে কিছু দেন তবে আল্লাহ পাকই প্রকৃত দাতা হবেন আর আপনি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আর যদি না দেন তবে তাতেও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই প্রকাশ পাবে। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অসমর্থতার কারণে দায়ী হবেন না।"[২]

হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) সমসাময়িককালের খ্যাতনামা ওলীয়ে কামিল ও অন্যান্য সিলসিলার প্রবীণ বুযুর্গদের সাথেও বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি তাঁদের মর্তবা ও মর্যাদার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী(র), যিনি সুহরাওয়ারদিয়া তরীকার

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০;

২. আখবারুল আখয়ার –আসল চিঠি অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষায় লিখিত।

খ্যাতনামা মুরশিদ এবং ভারতবর্ষের অন্যতম প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা ও মুবাল্লিগ তাঁরই সমসাময়িককালের–সম্ভবত সমবয়সী ছিলেন।[১] উভয়ের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও খোলামেলা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত। হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) শায়খ বাহাউদ্দীন (র)কে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে সম্বোধন করতেন। উভয়ের খলীফা ও মুরীদবর্গও নিজেরা গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হতেন। তাঁরা একে অপরের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। শায়খুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র)-এর পৌত্র শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল ফাত্‌হ (র) এবং শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর খলীফা সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর ভেতর বিরাট হৃদ্যতা ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র)-এর জীবনের প্রকৃত ও আসল সম্পদ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বিপুল আগ্রহ ও আবেগ, ঐশী প্রেমে মত্ততা ও আল্লাহ্‌রই জন্য পাগলপারাপ্রায় অবস্থা। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, শায়খুল কবীর হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন(র) নিজস্ব হুজরায় (কামরা) ছিলেন। মাথা ছিল উন্মুক্ত আর চেহারা ছিল পরিবর্তিত। হুজরার মধ্যে পাগলের মত তিনি পায়চারী করছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

خواہم کہ ہمیشہ دروفائے تو زیم ۔ خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم
مقصود من خستہ زکونین تونی ۔ از بہر تو میرم ازبرائے تو زیم

অর্থাৎ "আমার ইচ্ছা যে সর্বদাই তোমার হয়েই আমি বেঁচে থাকি, মাটিতে মিশে যাই, তোমারই পায়ের তলায় আমি জীবন কাটিয়ে দেই। আমার মত নিঃস্ব ও সর্বহারার ইহকালে ও পরকালে একমাত্র কাম্য তুমিই। তোমারই জন্য বেঁচে থাকি আর তোমারই জন্য মারা যাই। "

এই কবিতা আবৃত্তির পর তিনি সিজদাবনত হয়ে মাটিতে মাথা রাখছিলেন, অতঃপর আবার এই কবিতাই আবৃত্তি করছিলেন এবং কামরার মধ্যে চতুর্দিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। এভাবে তিনি বার বার সিজদায় পড়ছিলেন এবং বহুক্ষণ ঐ অবস্থায় কেটে যাচ্ছিল।[২]

---

১. শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (র)-এর জন্ম ৫৬৬ হিজরীতে এবং শায়খ ফরীদ(র)-এর জন্ম ৫৬৯ হি.।

২. সিয়ারুল আওলিয়া;

আল্লাহ্‌র ভয়ে তিনি সব সময় কাঁদতেন। কখনও উপদেশপূর্ণ কথা শুনলে কিংবা মর্মস্পর্শী বর্ণনা কানে এলে অথবা তাঁর সামনে প্রেমোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করা হলে কিংবা কোন বুযুর্গের কোন প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা শুনলে তিনি বে-এখতিয়ার কেঁদে ফেলতেন। কোন সময় অবিরাম কাঁদতে থাকতেন। সর্বদাই সিয়াম পালন করতেন। পবিত্র কুরআনুল করীম হেফজ ও তেলাওয়াতের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং এ দু'টোর (সিয়াম ও কুরআন হেফ্‌জ-এর) জন্য খাস খলীফা ও বিশেষ বিশেষ মুরীদকে ওসিয়ত করতেন ও তাকিদ দিতেন।[১] তিনি সামা'র (এক প্রকার প্রেম ও ভক্তিমূলক গযল) প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কেউ বলেছিল, সামা'র বৈধতা নিয়ে 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তাতে তিনি বলেন ঃ

سبحان الله! یکے سوخت وخا کستر شد دیگرے ہنوزدر اختلاف است

"সুবহানাল্লাহ ! একজন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর তারা এখনও মতভেদেই লিপ্ত রইল।"[২]

তাঁর সারা জীবনের নীতি ছিল– ধনী ও ক্ষমতাসীনদের থেকে দূরে অবস্থান, নিজের অবস্থা গোপন রাখা এবং দরবেশী জীবন যাপন করা। স্বীয় প্রবীণ বুযুর্গদের রীতি-নীতি ও চলন-পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করে এবং সেগুলোর মধ্যে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার হেফাজত তথা তরীকার প্রচার ও প্রসারের গোপন রহস্য নিহিত আছে জেনে তিনি তার উপরই শক্ত ও সুদৃঢ়ভাবে কায়েম ছিলেন। আপন তরীকতের (তরীকতে চিশতিয়া) একজন ভাই হযরত শায়খ বদরুদ্দীন গযনভী (র) [যিনি ছিলেন হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর শ্রেষ্ঠ খলীফাদের অন্যতম] সাম্রাজের কিছু অমাত্যবর্গের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তারা শায়খ গযনভী (র)-এর জন্য দিল্লীতে একটি খানকাহ তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে তাঁর খেদমতও করতেন। বিপ্লবাত্মক রুযী-রোযগারের কারণে যখন তিনি শাহী আমীরের রোষানলে পড়েন তখন তাঁকে বেশ দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। তিনি এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের আশায় শায়খুল কবীর হযরত গঞ্জে শকর (র)-এর নিকট দু'আ প্রার্থী হলে তিনি জবাবে লিখেছিলেন ঃ

" যে ব্যক্তি নিজস্ব পদ্ধতিতে চলতে চাইবে সে অবশ্যই এমন অবস্থায় পতিত হবে যেখানে সে সর্বদা অস্থির ও পেরেশান থাকবে। আপনি তো পীরানে

১. সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

২. সিয়ারুল আওলিয়া ;

পাক হযরত খাজা কাকী (র)-এর ভক্তদের অন্যতম। অতএব তাঁর তরীকা ও পদ্ধতির পরিপন্থী খানকাহ্ কেনই-বা নির্মাণ করলেন আর কেনই-বা সেখানে অধিষ্ঠিত হলেন? হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন (র) এবং হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর তরীকা ও জীবন-পদ্ধতিতে এটা ছিল না যে, নিজের জন্য খানকাহ্ নির্মাণ করে দোকান সাজাবেন। তাঁদের আদর্শ ও নীতিই ছিল নাম-নিশানাহীন নির্জন বাস।"[১]

এই স্বভাবগত ঝোঁক ও প্রবণতার কারণে এবং সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভীড় ও আনাগোনার ফলে ইন্তিকালের পূর্বে পুনরায় তাঁর জীবনে অভাব-অভিযোগ ও টানাপোড়েন দেখা দেয়। সিয়ারুল আওলিয়া পুস্তকে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন ঃ

"শুয়ূখুল-'আলম হযরত শায়খ ফরীদ (র) শেষ বয়সে ইন্তিকালের কাছাকাছি সময়ে খুবই আর্থিক অনটনের ভেতর ছিলেন। আমি রমযান মাসে তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এত অল্প পরিমাণ খাবার আসত যে, তা উপস্থিত লোকদের জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। সে সময় কোন রাত্রিতেই আমি পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি। খাদ্য-সামগ্রী যা দেখা যেত তা ছিল নিতান্তই সামান্য ও মামুলী ধরনের। আমি রওয়ানা হবার প্রাক্কালে হযরত শায়খ (র) আমাকে একটি সুলতানী (সম্ভবত সে যুগের প্রচলিত মুদ্রা) পথ খরচের জন্য দিলেন। ঐ দিনই মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের মাধ্যমে নির্দেশ পেলাম– আজ অবস্থান কর, কাল যেও। ইফতার মুহূর্তে হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। আমি জানতে পেরেই তৎক্ষণাৎ শায়খ (র)-এর খেদমতে যাই এবং আরয করি যে, হুযুরের দরবার থেকে আমাকে একটি সুলতানী দেওয়া হয়েছিল। যদি অনুমতি পাই তবে তা দিয়ে কিছু খানা-পিনার ইন্তিজাম করতে পারি। হযরত অনুমতি দেন এবং আমার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করেন।"[২]

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর বর্ণনা থেকে ইন্তিকালের অবস্থা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

"মুহাররাম মাসের পাঁচ তারিখে অসুখ অত্যন্ত বেড়ে যায়। 'ইশার সালাত জামাতেই আদায় করেন। সালাতের পর তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেলে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি 'ইশার সালাত আদায় করেছি?' সবাই বলল, 'হ্যাঁ!' তিনি বলেন, 'দ্বিতীয়বার পড়ি। জানি না কখন কি হয়।' তিনি দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করেন এবং এরপর আবারও বেহুঁশ হয়ে যান। এবার

১. সিয়ারুল 'আরিফীন, পৃষ্ঠা ৮৫; বযমে সূফীয়া থেকে গৃহীত।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৬৬ ;

বেহুঁশ অবস্থা ছিল দীর্ঘক্ষণ। হুঁশ ফেরার পর পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি সালাত আদায় করেছি?' জানানো হ'ল 'হ্যাঁ! আপনি ইতিমধ্যেই তা দু'বার আদায় করেছেন।' তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'আরও একবার আদায় করি। কে জানে কখন কি হয়?' এরপর তিনি তৃতীয় দফা সালাত আদায় করেন। অতঃপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।"[১]

ইন্তিকালের তারিখ ছিল ৫ই মুহাররাম, মঙ্গলবার, হিজরী ৬৬৪।[২] আজুদহনে (পাক পত্তনে) তাঁকে দাফন করা হয়। পরে সুলতান মুহাম্মদ তুগলক তাঁর কবরের উপর গুম্বজ নির্মাণ করে দেন।

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) পাঁচজন পুত্র সন্তান ও তিনজন কন্যা রেখে যান। পুত্রদের নাম যথাক্রমে শায়খ নাসরুদ্দীন নাসরুল্লাহ, শায়খ শিহাবুদ্দীন, শায়খ বদরুদ্দীন সুলায়মান, খাজা নিজামুদ্দীন ও শায়খ ইয়া'কূব। কন্যাত্রয় হলেন বিবি মাসতূরা, বিবি ফাতিমা ও বিবি শরীফা।

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর ওফাতের পর তৃতীয় পুত্র শায়খ বদরুদ্দীন সুলায়মান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁরই পুত্র সাজ্জাদানশীন শায়খ 'আলাউদ্দীন আজুদহনী (র) পবিত্রতা ও খোদাভীরুতার দিক দিয়ে অত্যন্ত মশহূর ছিলেন। মুহাম্মদ তুগলকও তাঁর মুরীদ দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।[৩] আল্লাহ পাক রূহানী সিলসিলার ন্যায় হযরত খাজা শায়খ ফরীদী-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশাবলীর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বরকত দান করেন। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে তাঁর বংশধরগণ ছড়িয়ে আছেন। সাধারণভাবে তাঁরা ফরীদী নামে খ্যাত। হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর পাঁচজন খলীফার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। এঁরা হলেন ঃ শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসুবী (র), শায়খ বদরুদ্দীন ইসহাক (র) , শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র), শায়খ 'আলী আহমদ সাবির (র) এবং শায়খ 'আরিফ (র)।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৮৯।

২. সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা কতিপয় স্থানে ৬৬৯ হিজরীর এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যা হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর জীবনী সম্পর্কিত। কতক জায়গায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর লিখিত বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, "হযরত খাজা (র) আমাকে এটা বলেছেন, এটার জন্য হেদায়াত করেছেন।" যদি ঐ সন সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করা হয় তবে ৬৬৪ হিজরী মৃত্যু তারিখ যা সাধারণভাবে মশহূর ও অধিকাংশ কিতাবেই উল্লিখিত ও বর্ণিত-তা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে এবং মেনে নিতে হয় যে, হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ওফাত এর পরে হয়েছিল। অন্যান্য পুস্তকে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অনুমান করা চলে যে, হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ওফাত ৬৭০ হিজরীতে হয়েছিল যা খাযীনাতুল-আসফিয়া ও তাযকিরাতুল 'আশিকীন নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে পেশ করা হয়েছে।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১৯৬;

শায়খ জামালুদ্দীন (আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ) খতীব হাঁসুবী (র) হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত খলীফা ছিলেন। তাঁরই খাতিরে তিনি সুদীর্ঘ ১২ বছর যাবত হাঁসিতে অবস্থান করেন। যখনই তিনি কাউকে খিলাফতনামা লিখে দিতেন তখনই বলতেন, "যাও, হাঁসিতে গিয়ে শায়খ জামালুদ্দীনকে দেখিয়ে নেবে।" যদি শায়খ জামালুদ্দীন খিলাফতনামা কবুল করে নিতেন তবে তিনিও কবুল করতেন। শায়খ জামাল নামঞ্জুর করলে তিনিও নামঞ্জুর করতেন এবং বলতেন, "জামালের ছেঁড়া জিনিস সেলাইয়ের অযোগ্য।" তিনি প্রায়ই বলতেন, "জামাল আমার সৌন্দর্য।"[১]

শায়খ জামালুদ্দীন স্বীয় শায়খ (র)-এর জীবদ্দশায় ৬৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ার [হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া এর প্রিয় খলীফা] তাঁরই পৌত্র।

শায়খ বদরুদ্দীন ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন 'আলী (র) ছিলেন বুখারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর খলীফা, খাদেম ও জামাতা ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন স্বীয় শায়খ(র)-এর শিক্ষা ও সাহচর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। চোখ থাকত সর্বদাই অশ্রুভেজা। প্রায়ই কাঁদতেন, যার ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, "আপনি যদি কান্না সংযত করেন তাহলে আপনার ব্যবহারের জন্য আমি সুরমা বানিয়ে দেব।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "চোখের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।" তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র পথে অব্যাহত প্রয়াস ও নিরলস সাধনা দেখে শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠত। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাধর ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। বহু দিন তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মু'ইয্‌যিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বুখারা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ফারসী ও আরবী ভাষায় এমত পরিমাণ ব্যুপত্তি লাভ করেন যে, এসব ভাষায় অবলীলাক্রমে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। পঠিত ও শিক্ষণীয় অধ্যায়কে পদ্যে ঢেলে সাজাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। 'কিতাবুস্‌-সরফের' সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর পদ্যে লিখিত একখানা পুস্তকও পাওয়া যায়। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর সালাতের ইমাম খাজা মুহাম্মদ ইমাম এবং খাজা মুহাম্মদ মুসা হযরত শায়খ বদরুদ্দীন ইব্‌ন ইসহাকেরই সাহেবযাদা ছিলেন। ৬৯০ হিজরীর ৬ই জমাদিউছ-ছানী তাঁর ওফাত হয়।[২]

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, সিয়ারুল আওলিয়া আখয়ার প্রভৃতি থেকে গৃহীত।
২. নূহাতুল খাওয়াতির।

শায়খ 'আরিফকে হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র) খিলাফত প্রদান করে সিবিস্তান পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি এ খিলাফতনামা স্বীয় শায়খ (র)-কে এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, এ বড় নাযুক দায়িত্ব। তিনি এতবড় দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নন। শায়খ (র)-এর দু'আ' ও অনুগ্রহই তাঁর জন্য যথেষ্ট। অতঃপর শায়খ (র)-এর এজাযত নিয়ে হজ্জ-পর্ব সমাধা করবার নিয়তে তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ রওয়ানা হন। পরে সেখান থেকে আর ফিরে আসেন নি।[১]

শায়খ-ই-কবীর 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্‌ন আহমদ সাবির ইসরাঈল বংশীয় ছিলেন। নির্জনবাস এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভের উদ্দেশ্যে দুরূহ সাধনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। পীরান কলীর নামক স্থানে 'ইবাদত, জনসেবা ও আত্মোন্নতির ভেতর মশগুল থেকে ১৩ই রবিউল আওয়াল, ৬৮১ হিজরী অথবা ৬৯০ হিজরীতে তিনি ওফাত পান। হযরত শায়খ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী এঁরই খলীফা ছিলেন।[২]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৮৪ ও ১৮৫ পৃষ্ঠা;

২. নুযহাতুল খাওয়াতির। আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, শায়খ 'আলী আহমাদ সাবিরের অবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক বর্ণনা ও ইতিহাস নীরব। সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে আমীর খোরদ তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন যে, শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (র) সন্দেহ পোষণ করেন যে, এটা হযরত শায়খ 'আলী আহমাদ সাবির পীরান কলীরীর বর্ণনা অথবা এ নামেরই অপর কোন বুযুর্গ ব্যক্তির বর্ণনা। আমীর খোরদ বলেন ঃ

"অধম নিজ ওয়ালিদ (র)-এর নিকট থেকে শুনেছে যে, একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবেশ ছিলেন যাঁকে 'আলী আহমাদ সাবির বলা হ'ত। তিনি দরবেশীতে অটল, মযবুত, নিসবত ও প্রভাবসম্পন্ন এবং ডিগ্রী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর মুরীদ ছিলেন এবং তিনি তাঁকে বায়'আত গ্রহণের এজাযতও দিয়ে রেখেছিলেন।"

সমসাময়িক কিংবা নিকটবর্তীকালের বর্ণনায় তাঁদের বর্ণনা থাককু আর নাই থাকুক কিংবা ছিটেফোঁটা ও সংক্ষিপ্তই থাকুক, তাঁদের সিলসিলার মহান বুযুর্গগণের অবস্থাদি, উচ্চ মর্যাদা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে আসন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের এই সিলসিলার জনপ্রিয়তার উপর ঐকমত্য এবং সারা দুনিয়ায় এর ফয়েয ও বরকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সাক্ষী যে, এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা অত্যন্ত উচ্চ মকাম ও উচ্চ নিসবতের অধিকারী, অধিকন্তু আল্লাহ পাকের নিকট মকবুল ও প্রিয় বান্দাহরূপে গৃহীত। ইতিহাসের সাক্ষ্যও এর থেকে বড় হতে পারে না। এটাই ইতিহাসের প্রথম অসতর্কতা ও ভুল নয়। প্রাচীনকালে বহু কামিল ব্যক্তি এমনও অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন যাঁরা ইতিহাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে গেছেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছেন।

এই সিলসিলায় (সাবিরীয়া চিশতিয়া) বড় বড় ও বিরাট মাশায়িখ, 'আরিফ, মুহাক্কিক ও সংস্কারক জন্মেছেন। যেমন হযরত মাখদুম আহমাদ 'আবদুল হক রুদাওভী (র)

(বাকী অংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (র) চিশতীয়া সিলসিলার প্রথম বুযুর্গ যাঁর প্রভাব-বলয় ও প্রতিপত্তি নিজের জীবদ্দশায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যিনি ভারতবর্ষের ইসলামী সমাজ জীবনকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেন। রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও দরিদ্রের পর্ণ কুটি র পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি নিজেকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন। তিনি ভারতবর্ষের বুকে তরীকতের প্রথম শায়খ ও আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক (মুরশিদ) যাঁর সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী পাওয়া যায়। অপরদিকে তাঁর পীর ও মুরশিদগণ লিখিত কোন কিছুই রেখে যান নি। তাঁদের খলীফাবর্গও স্বীয় পীর ও মুরশিদগণের মালফুজাত ও জীবনের ঘটনা ও অবস্থাদি না সংগ্রহ করেছেন, আর না তাঁরা স্বীয় শায়খ ও মুরশিদগণের মালফুজাত ও জীবনী-সংকলন তৈরি করেছেন।[১] কিন্তু তাঁর মালফুজাত ও জীবনী সংকলিত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'টো মূল্যবান, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উৎস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফাওয়ায়েদুল-ফুওয়াদ, আমীর হাসান 'আলা সিজযী (মৃত্যু ৭৩৭

(পূ. পৃ. পর) যাঁর পবিত্র বরকতময় সত্ত্বাকে কতক পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেছেন, হযরত শায়খ 'আবদুল্ কুদ্দুস গংগুহী (র), হযরত শায়খ মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদ্যোকারিয়া কানদেহলভী (র) প্রমুখ। আমাদের এযুগে ও আল্লাহতাআলা এই সিলসিলা দ্বারা দীন ইসলামের হেফাজতও বিশ্বব্যাপী রেনেসাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। এ মুহূর্তে সবচেয়ে ব্যাপক ও কার্যকরী এই সিলসিলা জোরদারভাবে সক্রিয়। দারুল 'উলুম দেওবন্দ এবং মাজাহিরুল 'উলুম সাহারানপুরের তা'লিমী খিদমত, মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (র)-এর লেখনী ও মাওয়া'ইজ গ্রন্থসমূহ ও সর্বশেষে মাওলানা ইলয়াস (র)-এর দাওয়াত ও তাবলিগী আন্দোলন অভিযানের দ্বারা এই সিলসিলার ফয়েয দুনিয়াব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী তারীখে মাশায়িখে চিশ্ত (চিশতিয়া তরীকায় মহান বুযুর্গদের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ "বিগত শতাব্দীগুলিতে কোন বুযুর্গই চিশতীয়া সিলসিলার সংস্কারমূলক মৌলিক নীতিগুলি এমনভাবে চুষে নিতে সক্ষম হননি যেমনটি মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র) সক্ষম হয়েছেন।" (২৩৪ পৃ.)আজও রায়পুরে হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির সাহেবের খানকাহ চিশতীয়া সিলসিলার প্রাচীন খানকাগুলির একাগ্রতা, কর্মতৎপরতা,-আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্নতা, প্রেম ও প্রীতির ও ব্যথা-বেদনার কর্ম-কোলাহলের স্মৃতিকেই জীবন্ত করে তোলে। আফসোস! হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির সাহেবের ওফাতের পর এ খানকাহটিও প্রাচীন অবলুপ্ত খানকাহগুলির তালিকায় স্থান পেয়েছে। "আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল"।– আল-কুরআন।

১. হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর মালফুজাত খায়রুল মাজালিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার হযরত পীর ও মুরশিদ জনাব সুলতানুল আওলিয়া কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুল-'আযীয বলেন ঃ আমি কোন কিতাব প্রণয়ন করি নাই এজন্যই যে, খিদমতে শায়খুল ইসলাম হযরত ফরীদুদ্দীন (র), শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) এবং বাকী অন্যান্য চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গগণ যাঁরা আমাদের শাজরার অন্তর্গত– কেউই কোন কিতাব প্রণয়ন করেন নাই। খায়রুল মাজালিস-এর অনুবাদ সিরাজুল মাজালিসের ৩৫ পৃষ্ঠা ;

হিজরী) এটি রচনা করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) এর প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা শুনেছেন এবং এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁর সাথী ও খাদেমবৃন্দও এর বিশুদ্ধতাকে সাধারণভাবে স্বীকার করেছেন এবং একে জীবনের ওসীলা ও তাবিযরূপে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় সিয়ারুল আওলিয়া; আমীর খোরদ সায়্যিদ মুহাম্মদ মুবারক 'আলভী কিরমানী (মৃত্যু ৭৭০ হিজরী) এটি রচনা করেন। আমীর খোরদ খোর্দসালগীতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর হাতে বায়'আত হন এবং তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। এরপর হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লীর হাতে বায়'আত হন। তাঁর পিতা নূরুদ্দীন মুবারক ইব্ন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কিরমানী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন -এর পুরনো বন্ধু, একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এ কিতাবের অধিকাংশ বর্ণনা তাঁর থেকেই নেওয়া হয়েছে। স্বীয় শায়খ হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর শোনা বহু বর্ণনাও এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজের চোখে দেখা অবস্থাদি ও নিজ কানে শোনা মালফুজাতও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবন ও ঘটনাপঞ্জী, তাঁর শ্রেষ্ঠতম খলীফাদের অবস্থা ও কামালিয়াতের এটাই বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য সংকলন। উল্লিখিত দু'টো কিতাবের ফলেই বিশেষ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবন ও অবস্থাদি, ঝোঁক ও স্বাভাবিক প্রবণতা, তা'লীম ও তরবিয়তের প্রক্রিয়া, সংস্কার ও প্রচারধর্মী নিরলস প্রয়াস ও সাধনা, তাঁর ফয়েয, বরকত ও প্রভাবপঞ্জী সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের উজ্জ্বলতর লেখনীমালার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে।

এ মহান ব্যক্তির মর্যাদা ও প্রভাব, বিভিন্ন অবস্থা ও উৎসমূলের সহজপ্রাপ্যতার কারণে দা'ওয়াত ও সুদৃঢ় সংকল্পের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ও যুগনায়ক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর সত্তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

---

১. এতে ৩রা শা'বান, ৭০৭ হিজরী থেকে ৯ই শা'বান, ৭২০ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন মজলিসের মালফুজাত সংকলিত হয়েছে।

হ্যরত শায়খ খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়া (র)

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত শায়খ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া(র)

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন (র)-এর জীবনী ও কামালিয়াত

নাম মুহাম্মদ, নিজামুদ্দীন উপাধিতে সাধারণ্যে খ্যাত ও পরিচিত। পিতার নাম আহমাদ ইব্‌ন 'আলী। তিনি ইমাম হুসায়ন (র)-এর বংশধর ছিলেন। মাতামহও সাইয়্যেদ বংশোদ্ভূত ছিলেন। পিতামহ খাজা 'আলী এবং মাতামহ খাজা 'আরব দু'জনেই একই পিতামহের পৌত্র ছিলেন। উভয়েই বুখারা থেকে এসে কিছুদিন লাহোর অবস্থান করার পর সেখান থেকে বদায়ূন আসেন।

৬৩৬ হিজরীতে তিনি বদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেন।[১] বদায়ূন (প্রাচীন বদাউন)[২] অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আবাসভূমি ছিল। বহু নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ ইরান ও খুরাসান প্রভৃতি স্থান থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর বয়স হিসাব করে উপরিউক্ত জন্ম সনকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন।

২. বদাউন রোহিলাখণ্ডের সুঠ নদীর বাম ধারে অবস্থিত। সে যুগে জনবসতিপূর্ণ ও জৌলুসপূর্ণ স্থান ছিল। দিল্লীর জন্য সীমান্ত শহর হিসাবে বিবেচিত হত। সেজন্য পুরাতন দিল্লীর একটি দরজার নামই ছিল বদাউন দরজা। (নুযহাতুল খাওয়াতির)

বদাউন কেল্লার বর্তমান ধ্বংসাবশেষ তার অতীত মর্যাদা ও সুদৃঢ় ভিত্তির স্বাক্ষর বহন করছে। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আয়বক একে জয় করেন এবং আপন ক্রীতদাস মালিক শামসুদ্দীন আলতামাশকে বদাউনের আমীর (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। আলতামাশ এখানে ১২২২ খ্রিস্টাব্দে একটি সুদৃশ্য ও প্রশস্ত মসজিদ নির্মাণ করান যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। দিল্লীর দু'জন বাদশাহ আলতামাশ এবং তাঁরই পুত্র রুকনুদ্দীন ফীরূয শাহ উভয়েই সিংহাসনে আসীন হবার পূর্বে বদাউনের গভর্নর ছিলেন (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, বুদায়ল বদাউন)। 'দীনি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি' নামক মওলবী মুহাম্মদ শফী' এমএ কৃত গ্রন্থ থেকে বর্ণিত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪১।

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

হযরত নিজামুদ্দীন পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। সৎকর্মশীলা ও আল্লাহ্‌ভক্ত মা এই ইয়াতীম শিশুর প্রতিপালন এবং তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ পুরুষোচিত সাহসিকতা ও পিতৃস্নেহে সম্পন্ন করেন। কিতাব পড়বার মত বয়সে উপনীত হলে তিনি মাওলানা 'আলাউদ্দীন উসূলীর'[১] সামনে নীত হন এবং ফিকাহ্‌র প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। কুদূরী সমাপ্ত করার পর মাওলানা 'আলাউদ্দীন বললেন, "মাওলানা নিজামুদ্দীন! এখন শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও ফযীলতের পাগড়ী মাথায় বাঁধ।" ঘরে এসে তিনি মাকে জানালেন, উস্তাদ তাকে দস্তারবন্দীর হুকুম দিয়েছেন। এখন দস্তার কোত্থেকে আনি? মা বললেন, বাবা! নিশ্চিন্ত থাক, আমিই তার বন্দোবস্ত করব। অতঃপর তুলা ক্রয় করে সুতা কাটিয়ে পাগড়ী বানিয়ে দিলেন।[২] এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে 'উলামায়ে কিরাম ও সে যুগের সৎকর্মশীল মহান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান হয়। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র) -এর মুরীদ খাজা 'আলী এক প্যাঁচ বাঁধেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ কল্যাণকর জ্ঞান ও সার্বিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দু'আ করেন।[৩]

কঠোর দারিদ্র্য ও মা'য়ের প্রশিক্ষণ

ছোট্ট অথচ অভিজাত পবিবার-যা পিতার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সইবে, তাতে আর বিচিত্র কি! আর এতে নতুনত্বেরও তেমন কিছুই নেই। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বলেনঃ মা'র অভ্যাস ছিল, যেদিন আমাদের ঘরে রান্না করবার মত কিছু থাকত না তখন তিনি বলতেন– আমরা আজ সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান। আমি একথা শুনে বড়ই মজা পেতাম। একদিন আল্লাহ্‌র জনৈক বান্দাহ স্বল্প পরিমাণের খোরাক ঘরে পৌঁছিয়ে যায়। পর পর বেশ কয়দিন তা দিয়ে রুটি প্রস্তুত হতে থাকে। আমি শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠলাম এবং এই আশায় থাকলাম–ওয়ালিদা সাহেবা কখন বলেন যে, আজ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র

---

১. মাওলানা 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-উসূলী শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র)-এর মুরীদ ছিলেন। স্বীয় শায়খ হযরত জালালুদ্দীন তাবরিযী (র)-এর পদাংক অনুসরণের উপর প্রচ্ছন্ন অবস্থা ও রহস্যের খুবই সযত্ন প্রচেষ্টা (ইহতিমাম) ছিল। সবর ও রেযামন্দী (ধৈর্য ও সন্তুষ্টি) সহকারে জীবন যাপন করতেন এবং সব সময় পরোপকার অথবা 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন (নুযহাতুল খাওয়াতির, ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদের বরাতে)।

২. খায়রুল মাজালিসের অনুবাদ সিরাজুল মাজালিস, পৃষ্ঠা ১৪৫;

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬;

মেহমান। শেষাবধি সে খোরাকীর শেষ দানাটুকু শেষ হবার পর আমার ওয়ালিদা সাহেবা বললেন, 'আজ আমরা সবাই আল্লাহ্র মেহমান।' এ কথা শোনায় যে পরিমাণ মজা ও আনন্দ পেয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত।[১]

শায়খুল কবীর[২] হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর সাথে সম্পর্ক এবং আন্তরিক মিল-মুহব্বত

হযরত খাজা শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেনঃ আমি তখন ছোট ছিলাম। বয়স সম্ভবত বারো বছর কিংবা তার কিছু বেশী অথবা কম। আমি তখন অভিধান পড়তাম। আবু বকর খাররাত নামে প্রখ্যাত এক ব্যক্তি–কেউ কেউ আবু বকর কাওয়ালও বলেন– আমার উস্তাদের নিকট আসেন। তিনি মুলতান হয়ে এসেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র)-এর নিকট থেকে আসছি। এর পর তিনি তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ওখানকার জনগণ সর্বদা আল্লাহ্র যিকরকারী, তাঁরই ধ্যানে মশগুল, সাথে সাথে বহুবিধ নফল বন্দেগীতে এমতরূপ মগ্ন এবং সেখানে যিকরের পরিবেশ এমনি যে, ঘরের চাকরাণী, সেবিকা ও দাসীবান্দীরা পর্যন্ত যাতায় গম পিষতে পিষতে যিকরে ইলাহীতে নিমগ্ন থাকে এবং এ ধরনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাই তিনি দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন জিনিসই আমার অন্তরে স্থান পাচ্ছিল না। এরপর লোকটি বলা শুরু করল যে, তারপর আমি সেখান থেকে আজুদহন আসলাম। সেখানে আমি এমত দীনদার বাদশাহ্র সাক্ষাত পেলাম। লোকটি শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর কথা আলোচনা করলেন। এটা শুনতেই আমার অন্তর মানসে প্রেম ও প্রীতির ফলগুধারা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত হয় এবং তাঁর মুহব্বত ও অন্তরের আকর্ষণ এমনতর ভাবেই স্থান করে নেয় যে. শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম নিতেই আমি স্বাদ অনুভব করতাম এবং আমি প্রতিটি সালাতের পরই আনন্দ ও উল্লাস সহকারে তাঁর নাম জপতাম।[৩]

দিল্লী ভ্রমণ

ষোল বছর বয়সে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বদায়ূন থেকে দিল্লী এসে উপস্থিত হন।[৪]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১১৩;
২. এই পুস্তকে শায়খুল কবীর বলতে প্রত্যেক স্থানে শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকুর (র)-কে বুঝানো হয়েছে।
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০০; ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ১৪৯
৪. এটা সিয়ারুল আওলিয়া বর্ণনা আর এটাই সহীহ্ ও বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কেননা দিল্লীতে তিন-চার বছর ছাত্রজীবন কাটানোর পর খাজা সাহেব আজুদহন যান এবং হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। বায়'আতের সময় তিনি বিশ বছর বয়সের ছিলেন বলে জানিয়েছেন। -সিয়ারুল আওলিয়া,-পৃষ্ঠা ১০৭)

দিল্লীতে ছাত্রজীবন

তিনি দিল্লী এসে শিক্ষা গ্রহণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এ সময় সীমা ছিল তিন থেকে চার বছর। দিল্লীতে সে সময় বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বর্তমান ছিলেন।[১] এটা ছিল সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদের রাজত্বকাল এবং তৎকালীন উযীরে আজম ছিলেন গিয়াছুদ্দীন বলবন। মাওলানা শামসুদ্দীন খারিযমী যিনি মুস্তাওফি'ল-মামালিক?[২] হয়ে শামসুল-মুল্ক উপাধি লাভ করেন; তিনি শিক্ষকদেরও মহান উস্তাদ-এর মর্যাদা রাখতেন। সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের যিম্মাদারী এবং নানাবিধ ব্যস্ততার সাথে সাথে তিনি সে যুগের 'উলামাদের মত পঠন-পাঠনের দায়িত্বও পালন করতে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র।

উস্তাদের প্রিয়পাত্র

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর সাথে মাওলানা শামসুদ্দীনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর তিনি ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শাগরিদ। তিনি নিজে যেই বিশেষ হুজরায় পড়াশুনা করতেন, সেখানে আর কোন শাগরিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু খাজা নিজাম (র) এবং তাঁর দু'জন বন্ধু মাওলানা কুতবুদ্দীন নাকিলা ও মাওলানা বুরহানুদ্দীন বাকী ছিলেন এর ব্যতিক্রম।[৩]

খাজা শামসুল মুল্‌কের অভ্যাস ছিল, যদি কোন শাগরিদ অনুপস্থিত থাকত কিংবা দেরী করে আসত, তবে তিনি বলতেন যে, আচ্ছা! আমার এমন কোন ত্রুটি হয়েছে যেজন্য আপনি আসেন নি? হযরত খাজা স্বয়ং এ কাহিনী বলতে গিয়ে মুচকি হেসেছেন এবং বলেছেন যে, যদি তিনি কখনও কাউকে ঠাট্টা করতে চাইতেন তবে বলতেন, আমার দ্বারা এমন কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে, আপনারা আসেন নি? কিন্তু আমি কখনো উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে কিংবা দেরী করে এলে আমার অন্তরে উদিত হ'ত যে, তিনি আজ আমাকেও এমনটি বলবেন, কিন্তু আমাকে দেখামাত্রই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন ঃ

اخر کم از آنکه گاه گاهے ـ ائی وبما کنی نگاهے

১. দেখুন কাযী জিয়াউদ্দীন বাণীকৃত তারিখে ফীরূযশাহী, ১১২ পৃষ্ঠা।

২. এটা ছিল হিসাব বিভাগীয় প্রধান বা একাউন্টেন্ট-জেনারেলের পদ যা বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিকেই দেওয়া হ'ত।

৩. সিয়ারুল- 'আরিফীন।

এটা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত এবং সমস্ত শ্রোতার উপর কান্নাবস্থা দেখা দিত। তিনি এও বলেন যে, তিনি নিজস্ব হুজরায় আমাকে সাথে বসাতেন। আমার শত আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তা মঞ্জুর করতেন না।[১]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আল্লাহ-প্রদত্ত অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তি দ্বারা সহপাঠীদের ভেতর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকার লাভ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরে (যা প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল) তাঁর বাকপটুতা ও বাকচাতুর্যের এবং প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপনা শক্তির এমন প্রকাশ ঘটে যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে কোন সমস্যা ও প্রশ্নের উপরই আলোচনা করতেন অন্যান্য ছাত্র তাতে লাজওয়াব হয়ে যেত এবং গোটা বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর সভায় তাঁর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। অতঃপর তাঁর সহপাঠিরা তাঁকে মাওলানা নিজামুদ্দীন 'বাহ্হাছ' (বাগ্মী) এবং মাওলানা নিজামুদ্দীন 'মাহফিল শেকন্' (মাহফিল ও বৈঠক চূর্ণ- বিচূর্ণকারী) উপাধিতে সম্বোধন করতে থাকে।[২]

'মাকামাত' কণ্ঠস্থ ও এর কাফফারা

সে যুগের পাঠ্যতালিকায় আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত পুস্তক 'মাকামাতে হারিরী' অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণভাবে ছাত্ররা পুস্তকটির মর্মোদ্ধার এবং তার কঠিন শব্দ ও বাক্যসমষ্টি মুখস্ত করাকেই যথেষ্ট মনে করত। কিন্তু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) তাঁর সীমাহীন জ্ঞানস্পৃহা, উচ্চ মনোবল ও সাহসিকতার দ্বারা এর চল্লিশটি মাকামাই মুখস্ত করে ফেলেন। পরে এরই কাফফারাস্বরূপ হাদীছের মশহূর কিতাব মাশারিকুল আনওয়ার মুখস্ত করেন।[৩]

হাদীছের এজাযত প্রাপ্তি

তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-মারিকলী যিনি কামালুদ্দীন যাহিদ (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরী) নামে বিখ্যাত-এর নিকট হাদীছ শিক্ষালাভ করেন যিনি 'মাশারিকুল আনওয়ার' প্রণেতা 'আল্লামা হাসান ইবনে

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৬৮ ;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা, ১০১;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০১ ;

মুহাম্মদ আস্-সাগানীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। 'ইল্মে ফিকাহ্তে (ইসলামী আইনশাস্ত্র) তিনি একই সুত্রে 'হিদায়া' প্রণেতা 'আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মরগিনানীর ছাত্র ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) তাঁর নিকট থেকে মাশারিকুল– আনওয়ারের দর্স গ্রহণ করেন এবং হাদীছ সম্পর্কে এজাযত লাভ করেন।[১]

অন্তরের অস্থিরতা এবং আল্লাহ্র দিকে ধাবমানতা

হযরত খাজা নিজাম (র) যদিও সমগ্র দেহ-মন দিয়ে শিক্ষা অর্জনের পেছনে নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁর উঁচু মনোবল ও সাহসিকতা এবং অটুট ও সুদৃঢ় সংকল্প এক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা ও গাফলতির প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী ছিল না, তথাপি তাঁর অন্তর-মানস অন্য কোন বস্তু অধীর আগ্রহে খুঁজে ফিরছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা এবং প্রকাশ্য জ্ঞানরাজ্যের উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁর প্রকৃতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে যেত। একদিন তিনি বলেন, "যৌবনে যখন লোকজনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলাম এবং তাদের সাথে উঠাবসা করতাম তখন সর্বদাই নিজেকে ভারাক্রান্ত মনে হ'ত এবং মনে মনে বলতাম, কখন আমি এ সমস্ত লোকের মাঝ থেকে চলে যেতে পারব–যদিও এ সমস্ত লোক ছিলেন শিক্ষিত ও সুধী এবং তাঁরা সর্বদা জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিষয় ও শাখা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, তথাপি অধিকাংশ সময়ই তাদের প্রতি আমার প্রকৃতি থাকত চরমভাবে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের বলতাম, 'দেখ, আমি কিন্তু চিরদিন তোমাদের মাঝে থাকব না। কিছুদিন তোমাদের এখানে আমি মেহমান মাত্র।' আমীর হাসান 'আলা সিজযী (র) বলেন, "আমি আরয করলাম, এটা কি শায়খুল ইসলাম হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর খেদমতে হাযির হবার পূর্বেকার ঘটনা?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"।

ওয়ালিদা সাহেবার ইন্তিকাল

দিল্লীতে অবস্থানকালীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর শ্রদ্ধেয়া ওয়ালিদা সাহেবা ইন্তিকাল করেন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১০৫ পৃষ্ঠা। এজাযতনামা আরবীতে লিখিত এবং সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে তা অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। এজাযতনামা ২২ শে রবিউল আওয়াল ৬৭৯ হিজরীতে প্রদত্ত। যার অর্থ এই যে, যখন তিনি এজাযতনামা পান তখন তাঁর বয়স (জন্ম তারিখ ৬৩৬ হিজরী হিসাবে) ৪৩ বছর ছিল এবং এ ঘটনা শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ওফাতের ১৩ বছর পরের ঘটনা এবং সে সময়কার ঘটনা, যখন তিনি নিজেই জনগণের হেদায়াত ও ইরশাদ এবং তা'লীম ও তরবিয়তের আসনে সমাসীন এবং তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

মা'য়ের স্মৃতি চারণ

অনেককাল পর একদিন হযরত খাজা (র) স্বীয় মা'য়ের ইন্তিকালের কথা বর্ণনা করেন। বর্ণনা করতে গিয়ে এমত পরিমাণ কেঁদেছিলেন যে, অতিরিক্ত কান্নার ফলে তিনি যা কিছুই বলছিলেন কিছুই পুরাপুরি বোঝা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

আল্লাহ্‌র প্রতি মায়ের ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন, "একদিন নতুন চাঁদ দেখে মায়ের খেদমতে হাযির হলাম এবং কদমবুসি করলাম। অতঃপর পবিত্র চাঁদ দেখার শুভ সংবাদ বরাবরের মতই পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'আগামী মাসে চাঁদ দেখা উপলক্ষে কার কদমবুসি করবে?' আমি বুঝে ফেললাম যে, ইন্তেকালের মুহূর্ত সমাগত। দুঃখ ও বিষাদে আমার অন্তর-মন ভরে গেল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমি বললাম, আম্মা! এ অধম ও গরীব বেচারাকে কার কাছে সোর্পদ করে যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে জানালেন, এর জবাব আগামী কাল পাবে। আমি আপন মনেই বললাম, এ মুহূর্তেই কেন তিনি জবাব দিচ্ছেন না। তিনি এও বললেন, যাও! আজ রাত শায়খ নজীবুদ্দীনের ওখানেই কাটাবে। মা'য়ের নির্দেশ মুতাবিক আমি সেখানেই গেলাম। শেষ রাতে ভোরের দিকে ঘরের সেবিকা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ডেকে বলল, বিবি সাহেবা তাঁকে ডাকছেন। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম , সব ভবর ভাল তো? সে 'হাঁ' বলায় আমি নিশিন্তে মা'য়ের খেদমতে হাযির হলে তিনি বলেন, গতকাল তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে আর অমি তার জবাব দেবার ওয়াদাও করেছিলাম। এখন আমি তার জবাব দিচ্ছি। মনোযোগ সহকারে শোন। তিনি বললেন, তোমার ডান হাত কোন্‌টি ? আমি আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার ডান হাত নিজের হাতের মুঠোর ভেতর টেনে নিলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ পরওয়ারদিগার! একে আমি তোমার হাতেই সোর্পদ করছি। একথা বলেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমি এতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করলাম আর আপন মনেই বললাম যে, আমার আম্মা যদি স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় পূর্ণ একটি ঘরও আমার জন্য রেখে যেতেন তবুও আমি এত খুশী হতাম না।"[১]

একটি ভুল আকাংক্ষা

সে সময় রাজধানী দিল্লীর আকাশে-বাতাসে বিশেষ করে ছাত্র ও বিদ্বানমণ্ডলীর গোটা সমাজে বিচার ও ফতওয়া বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা ও

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৫১ পৃ;

চর্চা, এসব পদে 'উলামাদের নিযুক্তি এবং কাযী ও মুফতীদের জাঁকজমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন, উপরন্তু ধন-দৌলতের কিস্‌সা-কাহিনীতে বাজার ছিল সরগরম। হযরত খাজা নিজাম (র)-এর প্রকৃতিগত সৌভাগ্য এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক যোগ্যতা সত্ত্বেও সে সময় তাঁর বয়স ছিল কম। জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য এবং জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অভাব-অনটন তথা দারিদ্র্যের কারণে তাঁর মনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদলাভের বাসনা যদি জেগেই থাকে তবে তা মানবীয় প্রকৃতির পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। একদিন তিনি শায়খ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (র)-এর নিকট গিয়ে আরয করলেন, "দু'আ' করুন যেন আমি কাযী হতে পারি।" শায়খ নাজীবুদ্দীন কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) মনে করলেন হয়ত তিনি শুনতে পাননি। দ্বিতীয় বার কিছুটা উচ্চ শব্দে বললেন, "আমি আপনার নিকট দু'আ'র দরখাস্ত করছি যেন কোথাও কাযী হয়ে যেতে পারি।" "শায়খ উত্তর দিলেন, "অন্য আর যাই কিছু হও, কাযী হয়ো না।"[১]

আজুদহনে প্রথমবার উপস্থিতি

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) আজুদহন গিয়ে উপস্থিত হবার পুর্বেই দিল্লীতে শায়খুল কবীর (র)-এর আপন ভাই খাজা নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (র)-এর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে বেশ কিছুকাল অবস্থানও করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য, আলাপ-আলোচনা শায়খুল কবীর হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর প্রতি প্রীতি ও মুহব্বতের সেই স্ফুলিংগ যা অল্প বয়সে এবং বদায়ূনে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল– প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে ও নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করে। তিনি শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে হাযির হবার অটুট সংকল্প গ্রহণ করেন এবং শেষাবধি হাযিরও হয়ে যান।

প্রার্থী না প্রার্থনা পুরণকারী ?

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এ মোলাকাত এবং প্রথমবারের উপস্থিতির অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেই বলেছেন যে, আমি যখন শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে হাযির হই তখন তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের কারণে আমি আমার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি। মাত্র কোনক্রমে এতটুকুই উচ্চারণ করতে

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ২৮পৃ;

সক্ষম হয়েছিলাম, "কদমবুসি করতে অত্যন্ত আগ্রহী।" শায়খ (র) যখন দেখতে পেলেন আমি অত্যন্ত ভীত ও হতচকিত, তখন তিনি বললেন,

লকل داخل دهشة "প্রতিটি নবাগতই ভীত-বিহ্বল হয়ে থাকে।"[১]

মুরীদকে সাদরে গ্রহণ

শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-কে অত্যন্ত সমাদর করেন। তিনি ইরশাদ করেন, "এই ভিনদেশী ছাত্রটির জন্য জামাতখানায় যেন চারপায়ী বিছানো হয়।" হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "যখন চারপায়ী বিছানো হল, তখন আপন মনেই বললাম, আমি কখনোই চারপায়ীর উপর বিশ্রাম নেব না। কত সম্মানিত মুসাফির, আল্লাহ্‌র কালাম পাকের কত হাফিজ এবং আল্লাহ্‌র কত 'আশিক প্রেমিক ভূমিশয্যায় শায়িত আর আমি চারপায়ীর উপর কেমন করে শুই?" এ সংবাদ খানকাহ্‌র ব্যবস্থাপক মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক পর্যন্ত গিয়ে পৌছুতেই তিনি বললেন, "তুমি নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করবে, না কি শায়খ (র)-এর নির্দেশ মান্য করবে?" আমি বললাম, "শায়খ (র)-এর নির্দেশই মান্য করব।" বললেন, "তবে যাও। চারপায়ীর উপর শুয়ে পড়।"[২]

বায়'আত

এখানে উপস্থিত থাকাকালীন কোন এক মুহূর্তে যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য পুরণ করেন এবং শায়খুল কবীর (র)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত নেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর।[৩]

শিক্ষার ধারাক্রম অব্যাহত অথবা পরিত্যক্ত

সম্ভবত হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের কতকগুলি কিতাব অধ্যয়ন তখনও বাকী ছিল। গভীর আগ্রহ ও স্পৃহা দাবি করছিল যেন পড়াশোনার পাট এখানেই চুকিয়ে দেয়া হয় এবং প্রকৃত 'ইলম ও আল্লাহ্‌র মা'রিফত (পরিচয়) লাভের পেছনেই জীবন ব্যয় করা হয় যা মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষা আহরণ ও শিক্ষা প্রদানের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা প্রথমেও তাঁর সংবেদনশীল মন-মানসিকতা ও সদাজাগ্রত আত্মার উপর বোঝাস্বরূপ ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ও আবশ্যকীয় মনে

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৩১ পৃ;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১০৭ পৃ;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ ১০৭;

করে, উপরন্তু অন্য কোন অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে তিনি তাই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু যখন 'ইলমে য়াকীনের প্রতিষেধক এবং 'ইল্‌মে হাকীকীর উৎসমূল মিলে গেল তখন এ দীর্ঘ ধারাক্রম বজায় রাখা তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতির উপর দুর্বহ বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু যে শায়খ ও মুরশিদে কামিলের সাথে তিনি আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিক কামালিয়াত হাসিলের সাথে সাথে 'ইল্‌মের দিক দিয়েও কামিল ছিলেন। তিনি তরীকতের 'ইল্‌ম হাসিলের জন্য আবশ্যকমত জাহিরী 'ইল্‌ম হাসিল করাকেও অত্যন্ত দরকারী ও অপরিহার্য মনে করতেন। স্বয়ং তাঁর শায়খ ও মুরশিদও-এ হেদায়াত দান করেছিলেন। অতএব মাওলানা নিজামুদ্দীনের দ্বারা ইরশাদ (ধর্মীয় পথ-নির্দেশনা) ও তরবিয়তের (নির্দেশিত পথের বাস্তব প্রশিক্ষণ) যে দুনিয়াব্যাপী দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া স্রষ্টার অভিপ্রেত ছিল সেরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার ছিল গভীর পাণ্ডিত্যের। এমনিতেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ শায়খ ও মুরশিদগণ আল্লাহ্‌র যিনি প্রার্থী, তাঁর গণ্ডী ও সীমারেখার দিকটিও দেখে থাকেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বায়'আত গ্রহণের পর বললেন, "লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে কি নফল 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত -মুজাহাদায় লিপ্ত হয়ে পড়ব?" শায়খুল কবীর (র) বললেন, "আমি কাউকেই লেখাপড়া ও শিক্ষা লাভের পথ ছেড়ে দিতে বলি না। ওটাও কর এবং এটাও কর অর্থাৎ লেখাপড়ার সাথেই আধ্যাত্মিক সাধনাও চালিয়ে যাও। দেখতে থাক কোনটি বিজয়ী হয়।" তিনি আরও বললেন, "দরবেশের জন্যও অল্পবিস্তর 'ইল্‌ম হাসিল করা অবশ্যই উচিত।"[১]

শায়খুল কবীর (র) থেকে দর্‌স গ্রহণ

শায়খুল কবীর (র)-এর বিশেষ অনুগ্রহ ও খাস মেহেরবানী যে, তিনি স্বয়ং খাজা নিজাম (র)কে সরাসরি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিষয় পড়াতে শুরু করেন। তিনি বলেন, "নিজাম! তোমাকে কিছু কিতাব আমার থেকেও পড়তে হবে।" অতঃপর শায়খগণের ইমাম হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদী (র)-এর তাসাওউফ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ কিতাব আওয়ারিফুল মা'আরিফ-এর দর্‌স দেওয়া শুরু করেন এবং ছয়টি অধ্যায় পড়ান। এ ছাড়াও আবূ শাকূর সালেমীর ভূমিকাও প্রথম থেকে শেষ অবধি পৃথক পৃথক পাঠ করে শিক্ষা দেন। অধিকন্তু তিনি 'ইলমে তাজবীদও শিক্ষা দেন এবং পবিত্র কুরআনুল করীমের ছয় পারা তাজবীদ সহকারে পড়ান।[২]

১ সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ ১০৭;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০৬;

'দরস'-এর আনন্দ

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বহুকাল অতীত হবার পরও উক্ত দরসের আনন্দ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতেন। তিনি বলতেন, "আওয়ারিফ-এর দরস গ্রহণ কালে যে সমস্ত হাকীকত ও গোপন রহস্য হযরত শায়খুল কবীর (র)-এর মুখ থেকে শুনেছিলাম তা আর কখনও শুনতে পারব না। হযরত শায়খ (র)-এর যাদুকরী ও বিস্ময়কর বর্ণনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এমনি ছিল যে, তিনি যখন ধর্মীয় ভাষণ দিতেন তখন কায়মনে আকাংক্ষা পোষণ করতাম−কত সুন্দর হ'ত, যদি আমি এ অবস্থায় মারা যেতাম!"[১]

আত্মবিলুপ্তির শিক্ষা

'আওয়ারিফ'-এর যে কপি দরস প্রদানের সময় হযরত শায়খ (র)-এর হাতে থাকত, তা ছিল কিছুটা ত্রুটিযুক্ত এবং লেখাগুলি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কয়েকটি সবকের পরই এমন একটি জায়গা এল, যেখানে শায়খ (র)কে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত থাকতে হয়। হযরত খাজা নিজাম (সরলতা ও তারুণ্যের কারণে) বলে বসেন, "আমি শায়খ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের নিকট অন্য আর একটি কপি দেখেছি। উক্ত কপিটি বিশুদ্ধ ছিল।" শায়খুল কবীর (র) বললেন, "ফকীর-দরবেশেদের ভুলত্রুটিযুক্ত কপি সংশোধনের ক্ষমতা নেই।" কয়েকবারই তিনি কথাটি আওড়াতে থাকেন। হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "প্রথম দিকেতো খেয়ালই করতে পারি নি। কিন্তু বারবার আওড়ানোর ফলে সহপাঠী মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক আমাকে বলেন, "শায়খুল কবীর (র)-এর কথার লক্ষ্যস্থল তো তুমি।" হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের তো তখন হুঁশ হারাবার উপক্রম। তিনি বলেন ওঠেন, "না'উযুবিল্লাহ! এর দ্বারা হযরত শায়খুল কবীর (র)-এর উং আপত্তি উত্থাপন করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না।" হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "আমি বারবার ওযরখাহী করলাম, কিন্তু তাঁর বিমর্ষ ভাব দুর হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।" তিনি বলেন, "অবশেষে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। সে দিন দুঃখ ও বিষাদের যে পাহাড় আমার উপর ভেঙে পড়েছিল এবং সমস্ত দিনটা যেভাবে কেটেছিল সম্ভবত আর কারও জীবনে তেমন দিন আসে নি। দুঃখ ও বিমর্ষচিত্তে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। একবার এমনও মনে হয়েছিল যে, কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনটাই শেষ করে দেই। কিন্তু শান্তভাবে চিন্তা-ভাবনার পর সে কল্পনা পরিত্যাগ করলাম। এরূপ পেরেশান ও হয়রান অবস্থায় আমি জঙ্গলের দিকে চললাম এবং বহুক্ষণ কেঁদে কাটালাম।"

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৭৫;

শিহাবুদ্দীন নামে শায়খুল কবীর (র)-এর জনৈক সাহেবযাদার সাথে খাজা নিজাম (র)-খুবই অন্তরঙ্গতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনি শায়খুল কবীর (র)-এর নিকট খাজা নিজাম(র) -এর উপরিউক্ত অবস্থার বর্ণনা দেন। মনের আকাংক্ষা পূর্ণ হ'ল। শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হবার অনুমতি মিলে গেল।

দ্বিতীয় দিনে তিনি নিজেই ডেকে পাঠালেন। বললেন, "এ সবই তো তোমার পূর্ণতা প্রাপ্তির স্তরে উপনীত হবার জন্যই করা হয়েছে। পীর মুরীদের কল্যাণকামী ও সংশোধন অভিলাষী হয়ে থাকেন।"

চূড়ান্ত মুহূর্ত

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জন্য সে মুহূর্তটি –যখন শায়খুল কবীর (র) তার কথা, 'আমি শায়খ নজীবুদ্দীনের নিকট একটি উত্তম কপি দেখেছি' শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন– অত্যন্ত কঠিন ও নাযুক মুহূর্ত ছিল। বাহ্যত এরূপ একটি নির্দোষ ও নিষ্পাপ বাক্য বলাতে এবং এই সংবাদ জ্ঞাত করাতে যে, আমি আপনারই ভাইয়ের নিকট উত্তম একটি কপি দেখেছি–এমন পরিমাণ অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কামিল শায়খ এমন একজন ছাত্র থেকে যিনি ভাবী জীবনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন এবং যাঁকে গণমানুষকে আত্মশুদ্ধির তরবিয়ত দিতে হবে–এতটুকু অহমিকা থাকা ও পছন্দ করেননি। তদুপরি আল্লাহ্র পথের নবীন এই পথিককে হালতের যে পূর্ণতম স্থানে পৌছুতে হবে তজ্জন্য তার অস্থিরতা ও অভাববোধ জাগ্রত করা এবং অন্তর-মানসকে দ্রবীভূত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একজন ধীমান, যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের পক্ষে– যে জ্ঞানের সর্বোচ্চ ধাপ অতিক্রম করেছে– এ সময়টি ছিল অত্যন্ত নাযুক আর এরই উপর তাঁর গোটা ভবিষ্যত নির্ভর করছিল। মাওলানা সাইয়্যেদ মানাজির আহসান গিলানী ঠিকই লিখেছেন ঃ

"প্রার্থীর মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক তার পার্থক্য ও যাচাই-বাছাই করার মুহূর্ত সমাগত। দুনিয়া দেখছিল–এখন মাওলানা নিজামুদ্দীনের সিদ্ধান্ত কি হয়? মাওলানা কি 'বাহহাছ' (তর্ক-বিতর্ককারী, তার্কিক) অথবা 'মাহফিল শেকন' (আলোচনা বৈঠক চূর্ণ-বিচূর্ণকারী)-এর উপাধি নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন যেমনটি আরও লাখো 'বাহহাছ' ও 'মাহফিল শেকন' দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চে এসেছে, আবার চিরাচরিত নিয়মে বিদায় নিয়ে চলেও গেছে অথবা মাশায়িখে কিরামের নেতৃত্বের যে সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে–তার উপর আসীন হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

"হিম্মত ও দৃঢ় মনোবলের দিক দিয়ে ঘাটতি হলে বলতে পারতেন– ভালো! আমার কি অপরাধ? আমি কি অন্যায়টাই বা এমন করেছি? একটা ভাল কপির সন্ধান জানতাম, সেটাই প্রকাশ করেছি, আর এর জন্য এত রোষ ও উষ্মা প্রকাশের অর্থ কি? এই ছোট্ট ঘটনাটিই যদি সামনে এসে যেত, তবে এটাই লম্বা ফিরিস্তিতে রূপ নিতে পারত-এত লম্বা যে, শয়তানের ভূড়িও তার তুলনায় ছোট্ট বলে প্রমাণিত হত। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে, তিনি নিজের আত্মার চিকিৎসার্থে এসেছিলেন, শায়খুল কবীরের কমযোরী ও দুর্বলতার চিকিৎসা করানো আজুদহন আসবার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, এটা চিকিৎসকের প্রতিষেধক মাত্র। এরপর সমালোচনার সুযোগ ও অধিকারই-বা তাঁর ছিল কোথায়?"[১]

বন্ধুর ভর্ৎসনা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন যে, "আমি শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে আজুদহনে অবস্থান করছিলাম। জনৈক 'আলিম, যিনি আমার দোস্ত ও সহপাঠী ছিলেন॥ তখন আজুদহন আসেন। তিনি আমার গায়ে ছেড়া-ফাঁটা পুরনো একটি কুর্তা দেখে অত্যন্ত উদ্বেগ ও আফসোসের সাথে বললেন, 'মাওলানা নিজামুদ্দীন! তুমি নিজের এ কি অবস্থা করেছ? তুমি যদি কোন শহরে গিয়ে পঠন-পাঠনে লিপ্ত থাকতে তাহলে তুমি এযুগের মুজতাহিদ হতে পারতে এবং বিরাট শান-শওকতের সাথে জীবন-যাপন করতে পারতে।' আমি আমার দোস্তের এ সব কথাই শুনলাম এবং নানাবিধ ওযরখাহী করে বিদায় দিলাম। এরপর যখন আমি শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে হাযির হলাম তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলতে শুরু করলেন, 'নিজাম! যদি তোমার কোন দোস্ত তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে আর তোমাকে তোমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং বলে, কেন তুমি পঠন-পাঠনের সে পেশা ছেড়ে দিলে যা তোমার অবস্থার পরিবর্তন ও সৌভাগ্য লাভের কারণ ঘটত, তাহলে তুমি তার কি উত্তর দেবে?' আমি আরয করলাম, 'শায়খ আমাকে যা বলার নির্দেশ দেবেন আমি তাই বলব।' এতে তিনি বললেন, 'যদি কখনও আর কেউ তোমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করে তবে তুমি এই কবিতাটি তাকে শুনিয়ে দেবে ঃ

نه همر هی تو مرا راه خویش گیرو برد

ترا سلامتی باد امر انگو نساری

১. ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫; "হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নিজামে তা'লীম ও তরবিয়ত"।

আমার এমন কোন সাথী নেই যে আমাকে আমার রাস্তায় পরিচালিত করবে; তুমি নিরাপদে থাক আর আমি আমার দীনতা নিয়েই তৃপ্ত থাকি।

"এরপর হুকুম হ'ল যে, খানকাহ্‌র বাবুর্চিখানা থেকে নানাবিধ খানা ভর্তি একটি পাত্র মাথায় করে উক্ত বন্ধুর নিকট নিয়ে যাও। আমি হুকুম তামিল করলাম। আমার দোস্ত যখন এ দৃশ্য দেখলেন তখন কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এসে পাত্রটি মাথা থেকে নামিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'এ তুমি কি করেছ?' আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সমস্ত শুনে তিনি বললেন, 'তোমাদের শায়খ এমন যে, তিনি তোমাকে আত্মশুদ্ধি ও বিনয়ের এত উচ্চ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তুমি আমাকেও তাঁর খেদমতে নিয়ে চল।' বন্ধুটির খাবার খাওয়া সমাপ্ত হলে স্বীয় চাকরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এই পাত্রটি উঠিয়ে আমাদের সাথে চল।' আমি বললাম, 'না, তা হয় না। এ পাত্র যেভাবে আমি মাথায় উঠিয়ে এনেছি ঠিক তেমনিভাবেই আমি মাথায় উঠিয়ে ফিরে যাব।' মোটকথা, আমরা উভয়েই শায়খুল কবীর (র)-এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমার দোস্ত হযরত শায়খ (র)-এর হাতে হাত দিয়ে বায়'আত নেন এবং ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।"

উপস্থিতি কত বার?

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) হযরত শায়খুল কবীর (র)-এর জীবদ্দশায় তিনবার আজুদহন গিয়ে হাযির হন। প্রথম বারে, না কোন বারে খেলাফত লাভের সৌভাগ্য ঘটে কোন জীবনী গ্রন্থেই তার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই।

শায়খুল কবীর (র)-এর অনুগ্রহ

কোন এক ২৫শে জমাদিউল আওয়াল সালাতুল জুম'আ বাদ আহবান এল। শায়খুল কবীর (র) নিজের মুখের থু থু হযরত খাজা শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর মুখে দিলেন এবং কুরআন মজীদ হেফজ করার ওসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ পাক তোমাকে দীন ও দুনিয়া উভয়ই দান করলেন।"

বিদায় ও ওসিয়ত

অতঃপর তিনি তাঁকে দিল্লীর দিকে রওয়ানা করে দেন। বিদায়কালে বললেন, "দিল্লী গিয়ে মুজাহাদায় মশগুল থাকবে। বেকার থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। নফল রোযা আল্লাহ্‌র পথে অর্ধেক এগিয়ে দেয়, আর সালাত ও হজ্জ (নফল) বাকী অর্ধেক।"

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তিনি তাঁকে লিখিত খেলাফতনামা দেন এবং হেদায়াত করেন যেন তা মাওলানা জামালুদ্দীনকে হাঁসিতে এবং কাযী মুনতাজিবকে দিল্লীতে দেখানো হয়। তিনি আরও ইরশাদ করেন, "তুমি একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষের ন্যায়। তোমার ছায়ায় আল্লাহ্র মাখলুক আরাম পাবে, আশ্রয় পাবে। যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বাড়াতে হলে এবং উন্নতি করতে হলে মুজাহাদা করতে থাকবে।"

হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "ফিরতি পথে হাঁসিতে আমি শায়খ জামালুদ্দীনকে খেলাফতনামা দেখালাম। তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।"

একটি দু'আর আবেদন

একদা ১লা শা'বান হযরত খাজা নিজাম (র)-এর তরফ থেকে শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে এই মর্মে দু'আ'র আবেদন পেশ করা হয় যেন সৃষ্টির পেছনে তাকে ঘুরতে না হয়। তাঁর আবেদনটি কবুল করা হয় এবং তিনি তার জন্য দু'আ' করেন।[১]

একবার তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্র নিকট তোমাদের জন্য অল্প কিছু দুনিয়াও চেয়ে নিয়েছি।" হযরত খাজা (র) বলেন যে, "আমি একথা শুনেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, যেখানে বড় ও মহান ব্যক্তিরা অবধি দুনিয়ার কারণে ফেতনা ও দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন সেখানে আমার মত লোকের কি অবস্থা হবে?" শায়খ তৎক্ষণাৎ বললেন, "তুমি ফেতনায় পড়বে না। ধ্যান ও বিনয় গচ্ছিত রাখবে।" এরপর আমি দুর্ভাবনামুক্ত হলাম।[২]

আজুদহন থেকে দিল্লী

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) স্বীয় মুরশিদ ও মুরব্বী থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক তথা রূহানীভাবে বিজয়, আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন ও বিধান মাফিক প্রশিক্ষণ দান এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার, তবলীগ ও হেদায়েতের মহান ও পবিত্রতম অভিযানে বের হলেন। একজন নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ফকীর ভারতবর্ষেরই নয় বরং হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোটা মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুসংহত ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে চলেছেন। শুধু ইখলাস, আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতা

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১১৬ পৃ;

২. সিয়ারুল আওলিয়া পৃ, ১২৩।

এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট তামাম মাখলুকাত থেকে বিমুখতা ব্যতীত আর কোন পাথেয় কিংবা হাতিয়ার তাঁর ছিল না। মাওলানা সাইয়্যেদ মানাজির আহসান গিলানী কী সুন্দরই না লিখেছেন।

"(তিনি) ভারত বিজয় অভিযানে আজুদহন থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীর দিকে রওয়ানা হচ্ছেন যেখানে নীচু পর্যায় থেকে উঁচু পর্যায় পর্যন্ত বেশুমার মিথ্যা 'ইলাহ' আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এর মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁদের সামান্য অংগুলী হেলনে মানুষের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদের মধ্যে তাঁরা আছেন যাঁদের সামান্যতম করুণা ও অনুগ্রহ মানুষকে মাটির আসন থেকে উঠিয়ে নেতৃত্ব ও সম্পদের আসমানে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। অলিতে গলিতে 'ইয্‌যত-আব্রু বিক্রী হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বণ্টিত হচ্ছে। চারদিকে টাকা-পয়সা ছড়ানো হচ্ছে। আর যে সমস্ত মাধ্যমে এসব অর্জিত হচ্ছে, সুলতানুল মাশায়িখ সে সবগুলিরই অধিকারী। তিনি পড়াশোনা করেছেন। আজুদহন যাবার আগে দিল্লীর জ্ঞানী-গুণীজনের সভায় 'সভামঞ্চের নায়ক' হিসেবে সাধারণ ও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আর কিছু না হোক, অন্তত বিচার বিভাগের কোন একটি পদ থেকে শুরু করে শায়খুল ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আসন পর্যন্ত সকল রাস্তাই তাঁর সামনে উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু স্রষ্টার আকৃতিতে যে 'ইলাহ্‌র' সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাতে তাঁর বুক এমন পরিপূর্ণ ছিল যে, সেখানে কোন মাখলুকের পক্ষেই স্থান সংকুলানের অবকাশ ছিল না।"

ন্যায্য অধিকার প্রত্যর্পণ

শায়খুল কবীর (র) মুরীদী ও খেলাফত প্রদানের সাথে সাথে কয়েকবারই তাকিদ দেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের খুশী ও সন্তুষ্ট করার সম্ভাব্য সকল প্রচষ্টা যেন গ্রহণ করা হয় এবং হকদারদের যেভাবেই হোক সন্তুষ্ট ও রাযী করাতে চেষ্টার যেন কোন ত্রুটিই না করা হয়। খাজা (র) বলেন, "আমি যখন দিল্লী চললাম তখন আমার স্মরণ হ'ল যে, জনৈক ব্যক্তির নিকট আমি বিশ 'জিতল' (অথবা চিতল)[১] দেনা আছি এবং কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কিতাব ধার নিয়ে এসেছিলাম। সেটা পরে হারিয়ে যায়। বদায়ূনে থাকাকালীন আমি সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম যে, যখনই দিল্লী পৌছুব তখন ঐ সমস্ত পাওনাদারকে সন্তুষ্ট ও রাযী করতে চেষ্টা করব। আমি আজুদহন থেকে দিল্লী ফিরে এলাম। যে ব্যক্তির নিকট বিশ জিতল ঋণী ছিলাম সে ছিল একজন কাপড় বিক্রেতা। আমি তার থেকে কাপড় খরিদ করেছিলাম। আমার নিকট কোন সময়েই বিশ

১. জিতল অথবা চিতল তামার মুদ্রা যা সে যুগে প্রচলিত ছিল।

জিতল সংগৃহীত হয়নি যে, আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারি জীবিকার ক্ষেত্রে আমি ছিলাম অত্যন্ত অনটনের ভেতর। কখনও পাঁচ জিতল হাতে আসে, কখনও-বা দশ জিতল। একবার দশ জিতল হাতে আসতেই আমি উক্ত কাপড় বিক্রেতার দরজায় গিয়ে হাযির। আওয়াজ দিতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। আমি তখন বললাম যে, তোমার বিশ জিতল আমার যিম্মায় আছে। একবারে দেবার সামর্থ্য আমার নেই। দশ জিতল সাথে এনেছি। এটা নিয়ে নাও। বাকী দশ জিতল ইনশাআল্লাহ এর পরে পৌঁছিয়ে দেব। লোকটি বলল, মনে হচ্ছে তুমি মুসলমানদের নিকট থেকে এসেছ। লোকটি উক্ত দশ জিতল নিয়ে নিল আর বলল, আমি বাকী দশ জিতল মাফ করে দিলাম।

"এরপর সেই লোকটির নিকট গেলাম যার কাছ থেকে কিতাব ধার নিয়ে ছিলাম। লোকটি আমাকে চিনতে পারেনি। আমি বললাম যে, একবার আমি একটি কিতাব আপনার নিকট থেকে ধার নিয়েছিলাম যেটা পরে হারিয়ে গেছে। এখন আমি উক্ত কিতাবের একটা কপি করে আপনাকে দিয়ে দেব। আমি কিতাবটি যেভাবে লেখা ছিল ঠিক সেভাবেই লিখে আপনাকে পৌঁছিয়ে দেব। লোকটি বলল, তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানকার পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে। এরপর সে বলল, আমি উক্ত কিতাবটি তোমাকে দিয়ে দিলাম।"[১]

দিল্লীর অবস্থানস্থল

খাজা সাহেব (র) যখন দিল্লীবাসীদের তথা ভারতবাসীদের খেদমতের জন্য দিল্লী পৌঁছলেন তখন যদিও দিল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহও শাহী মহল ও প্রাসাদোপম অট্টালিকা দ্বারা আবদ্ধ ছিল এবং যত্রতত্র নিত্য-নতুন ইমারত নির্মিত হচ্ছিল তবু খাজা সাহেব (র)-এর কোন অবস্থানের ঠিক ছিল না। অবস্থানস্থল হিসাবে গিয়াছপুরে যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি এত ঘন ঘন আবাস পালটিয়েছেন যে, মনে হচ্ছিল গোটা শহরে এই ফকীরের নিজের দরবেশী সাজ-সামান রাখবার এবং চাটাই বিছাবার মত একফোঁটা জায়গাও নেই। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা মীর খোরদ স্বীয় ওয়ালিদ সাইয়্যেদ মুবারক মুহাম্মদ কিরমানীর ভাষায় যিনি খাজা (র)-এর দোস্ত ছিলেন–বাসগৃহ পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা পাঠকদের উপদেশ গ্রহণের জন্য এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। সাইয়্যেদ মুবারক মুহাম্মদ কিরমানী বলেন ঃ

"যতদিন সুলতানুল মাশায়িখ [খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)] দিল্লী শহরে ছিলেন ততদিন তাঁর এমন কোন বাসা-বাড়ী ছিল না যা তাঁর মালিকানাধীন। তিনি সারা জীবন নিজস্ব এখতিয়ারে নিজের জন্য কোন স্থানও

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

নির্বাচন করেন নি। তিনি যখন বদায়ূন থেকে আসেন তখন মিঞা বাজার সরাইয়ে যাকে নেমকের সরাইও বলা হ'ত–অবতরণ করেন। ওয়ালিদা সাহেবা ও বোনকে সেখানেই রাখেন এবং স্বয়ং নিজে একটি কামানগীরের দরবারে যা. উল্লিখিত সরাইয়ের সামনে ছিল–স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। আমীর খসরু (র)-এর বাসাও ছিল উক্ত মহল্লাতেই। কিছুদিন পর বীর আরযের বাসা খালি হয়। তাঁর পুত্র নিজের এলাকায় চলে গিয়েছিল। আমীর খসরুর মাধ্যমে, যিনি বীর আরয -এর দৌহিত্র ছিলেন, সুলতানুল মাশায়িখের আবাসের জন্য বাড়িটি পাওয়া গেল। এই বাড়ীতে তিনি দু'বছর বাস করেন। বাড়ীটি শহরের নিকটবর্তী হিন্দুস্তান দরজা এবং মন্ধপুলের কাছেই ছিল। বাড়ীর মহল ও রোয়াক ছিল উঁচু ও অত্যন্ত শানদার। ইতিমধ্যেই বীর আরয-এর ছেলে এসে যায়। তাই সুলতানুল মাশায়িখকে উক্ত বাড়ী থেকে স্থানান্তরে গমন করতে হয়। নিজস্ব কিতাবাদি -যা ব্যতিরেকে আর কোন সামান তাঁর ছিল না– সমকক্ষীয় লোকদের মাধ্যমে ছাপড়াওয়ালী মসজিদে (যা সিরাজ বাক্কালের সামনে অবস্থিত ছিল) নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দিনে সা'দ কাগজী–যিনি শায়খ সদরুদ্দীনের অন্যতম মুরীদ ছিলেন–এ কাহিনী শোনেন এবং সুলতানুল মাশায়িখ-এর নিকটে এসে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা এবং অনুরোধ-উপরোধ সহকারে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। বালাখানার উপর একটি উত্তম ও সুন্দর কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। সেখানেই তাঁর থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়। সুলতানুল মাশায়িখ এখানে এক মাস অবস্থান করেন। এরপর এখান থেকেও বিদায় নেন এবং মিষ্টি বিক্রেতা ও বাবুর্চির সরাইয়ে–যা কায়সার পুলের সন্নিকটবর্তী ছিল– সরাইয়ের মাঝখানে একটি বাড়ীও ছিল–সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর সেখান থেকেও স্থানান্তরিত হয়ে মুহাম্মদ নামক ফল বিক্রেতার বাড়ীর মাঝখানে অবস্থিত শাদী গোলাবীর ঘরে অবস্থান নেন। এখানে অবস্থানকালীন শামসুদ্দীন শরাবদারের[১] পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন, যারা তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন–হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)কে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে শামসুদ্দীন শরাবদারের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। কয়েক বছর যাবত সুলতানুল মাশায়িখ এ বাড়িতেই থাকেন। এ বাড়ীতে থাকাকালীন তাঁর গোটা সময়টাই অত্যন্ত আরাম ও শান্তির মধ্যে কাটে।"[২]

দারিদ্র্য ও অনাহার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর দিল্লীতে আসার পর থেকেই বিবিধ পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের পালা শুরু হয় যা ডিংগিয়ে এ পথের পথিকদের

---

১. বাদশাহর পানি পান করানোর পদ।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১০৮ পৃষ্ঠা:

গোটা সৃষ্টি জগতের প্রত্যাবর্তনস্থল ও রূহানী ফয়েয লাভের উৎসমূলে পরিণত হতে হয়, আর তা আসে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। এটা ছিল সেই সময় যখন সারা ভারতবর্ষের ধন-দৌলত, সোনা-রূপা ও বিবিধ জওয়াহেরাত প্লাবনের বেগে এসে দিল্লীতে জমা হচ্ছিল। প্রাচুর্যের অবস্থা এমন ছিল যে, এক জিতলে দুই সের মজাদার রুটি পাওয়া যেত, আর দুই জিতলে মিলত একমণ খরবুযা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খাজা সাহেবের দারিদ্র্য ও অনটনের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি বলেন, "অনেক সময় আমার কাছে একটি কপর্দকও থাকত না যা দিয়ে রুটি কিনে আমি নিজে খাই এবং মা-বোন ও দায়িত্বাধীন ঘরের লোকদের খাওয়াই। খরবুযার প্রাচুর্য ও প্রচুর আমদানী সত্ত্বেও গোটা মৌসুম চলে যেত, কিন্তু আমাদের পক্ষে খরবুযার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হ'ত না। তথাপি আমি আমার অবস্থার প্রতি তুষ্ট ছিলাম আর কামনা করতাম মৌসুমের বাকী সময়টাও যেন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আমরা আগের অবস্থায়ই থাকি।"[১]

অন্যের মাধ্যম ব্যতিরেকে

একবার তিনি যখন শহরের প্রান্ত সীমায়মন্ধ দরজার সন্নিকটে অবস্থিত বুরুজে অবস্থান করছিলেন, কয়েক দিন কেটে যাবার পরও খাবার মত কোন কিছুর সংস্থান সম্ভব হয়নি। জনৈক ছাত্র জানতে পায় কয়েক দিন যাবত হযরত (র) অনাহারে ও চরম অনটনের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। তখন সে এ সম্পর্কে প্রতিবেশী কোন জোলাকে অবহিত করে। লোকটি খানা পাকিয়ে আনে। খানা খাওয়াবার প্রাক্কালে হাত ধোয়াবার সময় খানা আনয়নকারীদের ভেতর কেউ বলে বসে, 'আল্লাহ পাক ছাত্রটির মঙ্গল করুন যে, সময় মত আমাদের এ খবর পৌঁছিয়েছে।' খাজা (র) একথা শোনা মাত্রই হাত গুটিয়ে নেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'কি খবর দিয়েছে?' লোকটি বলে, 'অমুক ছাত্র আপনি যে কয়েক দিন যাবত অনাহারে আছেন তা আমাদের জানিয়েছিল। এরপর আমরা খাবার রান্না করে নিয়ে আসি।' এতে তিনি বললেন, 'আমাকে মাফ কর।' এরপর লোকের বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি সে খাবার আর গ্রহণ করেন নি।[২]

শায়খুল কবীর (র)-এর ওফাত

শেষ বার তিনি শায়খুল কবীর (র)-এর খেদমতে ওফাতের তিন চার মাস পূর্বে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, ৫ই মুহাররাম[৩] শায়খুল কবীর (র) ওফাত

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১১৩ পৃষ্ঠা;
২. জাওয়ামি'উল কালিম (খাজা সায়্যিদ মুহাম্মদ গেসু দরাজ (র)-এর মালফূজাত।
৩. হিজরী ৬৬৪;

পান এবং শাওয়াল মাসেই হযরত খাজা গঞ্জে শকর (র) আমাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। অসুখ-বিসুখ আগেই শুরু হয়েছিল। রমযান মাস। রোগ-যন্ত্রণার কারণে তিনি সিয়াম পালনে ছিলেন অপারগ ও অক্ষম। একদিন আমি খরবুযা কেটে শায়খ (র)-এর সামনে রাখলাম। শায়খ নিজে গ্রহণ করলেন এবং কাটা এক টুকরো আমাকেও দিলেন। সে মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল যে, জানি না এরূপ সম্পদ আবার কখন মিলবে যা আজ তিনি নিজের পবিত্র হাতে আমাকে দিলেন। ইচ্ছে হয়েছিল এটা আমি খেয়ে নিই এবং ধারাবাহিকভাবে দু'মাস সিয়াম পালন করে তার কাফফারা আদায় করি। তিনি বললেন, 'কখ্‌খনো নয়, এ হতে পারে না। আমার জন্য এমতাবস্থায় শরীয়তের অনুমতি থাকলেও তোমার জন্য তা কখনোই জায়েয হবে না।[১]

তিনি বলেন, ইন্তিকালের সময় তিনি [শায়খ ফরীদ (র)] আমাকে স্মরণ করেন এবং বলেন, নিজামুদ্দীন তো এখন দিল্লীতে। তিনি এও বলেন, আমিও আমার শায়খ কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর অন্তিম মুহূর্তে হাযির ছিলাম না। আমি ছিলাম তখন হাঁসিতে। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ কথার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এমন কান্না কেঁদেছিলেন যে, উপস্থিত সবার অন্তর এতে দ্রবীভূত না হয়ে পারেনি।[২]

ওফাতের পর তিনি আজুদহন উপস্থিত হন। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক শায়খুল কবীর (র)-এর ওসিয়ত মুতাবিক জামা, মুসাল্লা (জায়ানামায) ও লাঠি সোপর্দ করেন যা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)কে দেবার জন্য শায়খুল কবীর (র) মাওলানার হাতে সোপর্দ করেছিলেন।[৩]

গিয়াছপুরে অবস্থান

ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একদিন তিনি শহরের শোরগোল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, প্রথম থেকেই শহরে কোনদিনই আমার মন বসেনি। একদিন কেল্লাখানের হাওযের উপর ছিলাম। সে সময় আমি পবিত্র কুরআন মজীদ মুখস্ত করছিলাম। সেখানেই একজন দরবেশ আল্লাহ্‌র ধ্যানে ছিলেন। আমি তাঁর নিকটে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এই শহরেই থাকেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"। আমি বললাম, "আপনি নিজের মর্জি মাফিক এই শহরে থাকেন?" তিনি বলেন, "কথা তো তা নয়।" এরপর উক্ত দরবেশ একটি ঘটনার বর্ণনা দেন যে, একবার আমি অত্যন্ত সজ্জন

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ।
২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ; ৫৩।
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২২ পৃষ্ঠা;

এক দরবেশের সাক্ষাত পেলাম। কামাল দরজার বাইরে সেই বেস্টনীর মাঝে যেখানে একটি উঁচু জমি আছে এবং যার উপর শহীদগণের চার পার্শ্বের পাঁচিল নির্মিত সেখানেই উক্ত দরবেশ উপবিষ্ট। উক্ত দরবেশ আমাকে বললেন, "যদি ঈমান-আমানের মঙ্গল চাও তো এ শহর ছেড়ে চলে যাও।" আমি সেই মুহূর্ত থেকেই শহর ছেড়ে চলে যাবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। কিন্তু ঘটনা এমনভাবে মোড় নিচ্ছে যে, পঁচিশ বছর হয়ে যাচ্ছে তবু আমি যাবার সুযোগ পাচ্ছি না।" হযরত খাজা এ কাহিনী বর্ণনার পর বলেন যে, আমি এ শহরে থাকব না। কয়েকটি জায়গা সম্পর্কে আমার ধারণায় আসত বটে যে, আমি সেখানে চলে যাই, কখনও বা মনে মনে ভাবতাম যে, পিটয়ালী[১] শহরে চলে যাই। সে সময় সেখানে একজন তুর্ক ছিল। কখনও মনে করতাম যে, বিশনালা চলে যাব। সেটা একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। এরপর আমি সেখানেই চলে যাই এবং তিনদিন সেখানে থাকি। কিন্তু সেখানে ভাড়ায় কিংবা নগদ মুল্যে কোন বাড়িই পাওয়া যায়নি। ঐ তিন দিনই কারুর না কারুর মেহমান হয়ে থাকি। সেখানে থেকে যখন চলে আসি, একদিন সেখানকার একটি বাগানে–যাকে 'বাগে হায়রাত' বলা হয়–গিয়ে মুনাজাত করতে মনে সাধ জাগে। আমি আরয করলাম, খোদাওয়ান্দ! আমি হৈ শহরে চেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি। তবে কোন জায়গাই নিজস্ব মর্জি মুতাবিক এখতিয়ার করব না। যেখানেই তোমার মর্জি সেখানেই আমি চলে যেতে চাই। আকস্মিকভাবে এক গায়েবী আওয়ায শোনা যায়-যার মধ্যে গিয়াছপুরের নাম আসে। আমি গিয়াছপুর কখনও দেখিনি আর এটাও জানতাম না যে, গিয়াছপুর কোথায়। আমি আওয়াজ শোনার পর আমার একজন দোস্তের নিকট যাই। উক্ত দোস্ত ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী একজন নকীব। আমি তাঁর বাড়ি যাই এবং সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, তিনি গিয়াছপুর গেছেন। আমি মনে মনেই ভাবি যে, তাহলে সেটাই গিয়াছপুর। মোটকথা, আমি গিয়াছপুর আসলাম। সে জায়গায় আজকের মত আবাদী ও লোকবসতি গড়ে ওঠেনি। জায়গাটা ছিল অখ্যাত ও অজ্ঞাত। লোকজনও ছিল কম। আমি আসলাম ও বসবাস করতে শুরু করলাম। যখন সুলতান কায়কোবাদ[২] কিলোখড়িকে[৩] নিজস্ব আবাস হিসেবে মনোনীত করেন তখন

১. আম্বা জেলার একটি ছোট শহর।

২ সুলতান মু'ইয্যুদ্দীন কায়কোবাদ (হিজরী ৬৮৬ থেকে ৬৮৮ পর্যন্ত) বোগরা খানের পুত্র এবং সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের পৌত্র ছিলেন। রাজত্বকাল তিন বছর।

৩ স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান 'আছারুস্-সানাদীদ' নামক গ্রন্থে লিখেন যে, মু'ইয্যুদ্দীন কায়কোবাদ ৬৮৩ হিজরীতে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন এবং কিলোখড়ি তার নাম রাখেন। যদিও বর্তমানে উক্ত কেল্লার নাম-নিশানাও নেই, কিন্তু সম্রাট হুমায়ূনের সমাধি সৌধের পাশেই কিলোখড়ি এবং দশ-পাঁচটা ঝুপড়ীও সেখানে বিদ্যমান। চতুর্থ অধ্যায়, ৪র্থ পৃষ্ঠা; ।

থেকেই লোক সমাগম সেখানে বাড়তে থাকে। আমীর-উমারা, সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং তৎসহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আমি যখন লোকজনের এরূপ ভীড় লক্ষ্য করলাম, তখন মনে মনেই ভাবলাম-এখন দেখছি এখান থেকেও চলে যেতে হবে। আমি এরূপ ধারণায় যখন মগ্ন ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে একজন বুযুর্গ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যিনি আমার উস্তাদও ছিলেন –শহরে ইন্তিকাল করেন। নিজের মনেই বললাম, আগামীকাল যখন তাঁর ফাতেহাখানিতে যাব তখনই কোন দিকে বেরিয়ে পড়ার কথা চিন্তা করা যাবে। আপন মনেই এমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেদিনই সালাতুল- 'আসর বাদ একজন যুবক আমার নিকট আসে। যুবকটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু দুর্বল ও হালকা-পাতলা ধরনের। আল্লাহ্ই জানেন –সে আধ্যাত্মিক পথের কোন পথিকই ছিল অথবা অন্য কেউ। সে আসা মাত্রই আমাকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

آں روز که به شیدی نمی دانستی -
ِکه آنگشت نمائے جهاں خوا هی شد

" যেদিন আল্লাহ তোমাকে চাঁদ বানিয়েছিলেন সেদিনই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, তোমার দিকে সারা দুনিয়ার মানুষ অঙ্গুলী সংকেত করবে।"

হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন যে, যুবকটি আমাকে আরও কিছু বলেছিল যা আমি লিখে নিয়েছিলাম। এরপর সে বলল,প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের পক্ষে মশহূর হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আর যখন কোন ব্যক্তি মশহূর হয়েই যায় তখন এমন হওয়া উচিত যেন কিয়ামতের দিন রাসূল পাক (সা)-এর সামনে লজ্জিত হতে না হয়।

এরপর সে বলল যে, এটা কি ধরনের হিম্মত ও মনোবল যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্জনবাস গ্রহণ করা হবে? তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, শক্তি-সাহস ও মনোবলের অধিকারী হলে আল্লাহ্র সৃষ্ট মাখলূকের মধ্যে আল্লাহ্র ধ্যানে ও স্মরণে মশগুল থাকা সম্ভব। সে কথা শেষ করতেই আমি কিছু খাবার তার সামনে এনে রাখলাম। কিন্তু সে হাত বাড়াল না। তখনই আমি অন্তরে নিয়ত করে ফেলি যে, আমি এখানেই থাকব। যখন আমি এরূপ নিয়ত করে ফেললাম তখন সে অল্প খাবার খেয়ে চয়ে গেল।[১]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৯ পৃ;

জনস্রোত

গিয়াছপুরে অবস্থানকালে আল্লাহ্‌র বান্দারা হযরত খাজা নিজাম (র)-এর দিকে স্রোতের বেগে আসতে শুরু করে এবং এখান থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক বিজয়ের দরজা খুলে যায়।

তাযকিরা গ্রন্থসমূহ থেকে এটা জানা যায় না যে, কতদিন গিয়াছপুর অবস্থানের পর তাঁর পবিত্র ও বরকতময় সত্ত্বা জনতার দৃষ্টি ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং গিয়াছপুরের খানকাহ্‌র প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এতটুকু জানা যায় যে, গিয়াছপুরে অবস্থান গ্রহণের পরেও তিনি দীর্ঘকাল সংকট ও অভাব-অনটনের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত করেন। এমন কি বেশ কিছুকাল তিনি ভীষণ গরম ও লু-হাওয়া চলাকালীন সময়েও বেশ দুরে অবস্থিত জামে মসজিদে জুমু'আর দিন পায়ে হেটে যেতেন। এরূপ সংকট ও অনটনের পরই স্রষ্টার স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুটা সুখ-শান্তি ও স্বস্তির যুগ ফিরে আসে[১] এবং জনস্রোত এমনভাবে খানকাহমুখী হতে শুরু করে যে, তার সামনে দিল্লীর সুলতানের দরবারী মর্যাদাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

অনুগ্রহ বিতরণকারী ফকীর

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন ঃ পুরাতন অভ্যাগত ও মেহমান, নবাগতের মধ্যে পরদেশী অথবা শহরবাসী যেই তাঁর কাছে আসত, সন্দর্শন ও কদমবুসির সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হ'ত। তিনি কাউকেই বঞ্চিত করতেন না। পোশাক-আশাক, নগদ অর্থ এবং হাদিয়া-তোহফা যাই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসত সবকিছুই আগত ও বিদায়ী লোকজনের জন্য ব্যয় করা হ'ত এবং যেই আসুক না কেন, কখনই খালি হাতে ফিরে যেত না।[২]

হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) বলেন ঃ

"বিজয় অভিযানের অবস্থা ও নমুনা এমন ছিল যে, ধন-দৌলতের সমুদ্র দরজার সামনে ঢেউ খেলত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই নয় বরং 'এশা পর্যন্ত লোকজনের আসার বিরাম ছিল না। কিন্তু আনয়নকারীর চেয়ে গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। লোকে যাই কিছু আনত তার চেয়ে বেশী পরিমাণেই হযরত খাজা (র)-এর অনুগ্রহ পেত।[৩]

---

১. দুঃখের পর সুখ অবধারিত –নিশ্চয়ই দুঃখের পর সুখ অবধারিতভাবেই আসে। (আল-কুরআন)

২. সিয়ারুল আওলিয়া;

৩. সিরাজুল মাজালিস, (খায়রুল মাজালিসের অনুবাদ) হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর মালফুজাত;

জাগ্রত হবার পর প্রথম প্রশ্ন

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, দুপুরের আহার গ্রহণের পর কিছুক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে নিতেন। এরপর ঘুম থেকে উঠেই সর্বপ্রথম দু'টি সওয়াল জিজ্ঞেস করতেন। প্রথমত, বেলা কি চলে গেছে? এবং দ্বিতীয়ত, কেউ আসেনি তো? এটা এজন্য জিজ্ঞেস করতেন যেন কাউকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে না হয়।[১]

দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা

দুনিয়া তাঁর দিকে যে পরিমাণে ঝুঁকেছিল তাঁর প্রকৃতি ও মানসিকতাও সে পরিমাণে দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি কাঁদতেন। সাফল্য ও জয়যাত্রা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেত ঠিক সম-পরিমাণে তিনি কাঁদতেন এবং অনুরূপভাবেই তিনি প্রয়াস চালাতেন যেন তাঁর খেদমতে আনীত দ্রব্য ও সম্পদসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বিলি-বন্টিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পরই লোক পাঠিয়ে হেদায়াত দিতেন, যা কিছুই আসুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা বিলি-বণ্টন করে দেওয়া হয়। যখন সব কিছুই বন্টিত হয়ে যেত এবং অভাবী ও দুঃস্থ লোকদের নিকট তাদের প্রাপ্য পৌঁছে যেত তখন তিনি তৃপ্তি ও আরাম বোধ করতেন। প্রতি জুম'আর দিনে হুজরা ও ভাণ্ডার ঘর এমন করে খালি করে দিতেন যেন তিনি ঝাড়ু দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলছেন। এরপর তিনি মসজিদে যেতেন। যদি বাদশাহ কিংবা শাহযাদাদের মধ্যে কেউ তখন আস্তানায় হাযির হত এবং তাদের নযর-নেওয়াজ ও আগমন খবর পৌঁছত তাহলে নির্লিপ্ততার সুরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে তিনি বলতেন, কোথায় এসেছে? ফকীরের সময় নষ্ট করতে এসেছে?[২]

জমি-জায়গা ও অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে বিরত থাকা

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বলেন যে, একবার আমি উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একজন আমীর বাগান, অনেক জায়গা-জমি ও অন্যান্য আসবাবপত্রের দলীল-দস্তাবিজ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খেদমতে পাঠিয়েছিল এবং স্বীয় একনিষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল। হযরত খাজা (র) তা কবুল করলেন না বরং মুচকি হেসে বললেন, "যদি আমি এটাকে কবুল করি তবে এরপর লোকে বলাবলি শুরু করবে যে, শায়খ বাগান ভ্রমণে গেছেন এবং নিজ

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৬ পৃ.;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২০ পৃ;

জায়গা-জমি ও ক্ষেত-খামার দেখতে গেছেন। এসব কাজের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমাদের কোন শায়খ ও বুযুর্গ কেউই জায়গা-জমি কবুল করেন নি।"[১]

ফকীরের শাহী দস্তরখান

তিনি নিজে সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। কিন্তু শাহী দস্তরখানা দু'বেলাই বিছানো হ'ত এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এতে রাখা হ'ত। আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, শহরের নাগরিক ও পরদেশী, নেককার ও বদকার কারুরই বাছবিচার এতে ছিল না। সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষ এক জায়গায় বসে এবং একই সাথে খাবার খেত। নিয়ে যাবারও অনুমতি ছিল। কেউ কেউ খেত এবং বেঁধেও নিয়ে যেত। এই শাহী দস্তরখান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। এই দস্তরখানে বসে শত শত হাযার হাযার দরিদ্র মানুষের সেসব খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হ'ত যারা সেগুলোর নামও শোনেনি। শাহী দরবারের বড় বড় আমীর-উমারা এবং সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গেরও উক্ত দস্তরখানে শরীক হবার ইচ্ছে হ'ত এবং খাবারের স্বাদ ও গন্ধের কথা স্মরণ করত। লোকদের হেদায়াত তথা সৎপথ প্রদর্শন, সুলূক ও তরবিয়তের সাধারণ ফয়েয ছাড়াও (যার দরজা সব সময় খোলাই থাকত) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর এটাও একটি ফয়েয ছিল যা দিল্লীতে পূর্ণ প্রাচুর্যের সাথে অব্যাহত ছিল এবং তিনি লাখো আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌র লালন-পালনের মাধ্যম ছিলেন। মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী দরবেশের শাহী দস্তরখানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"আজ রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্যের কাহিনীর সাথে নিঃস্ব ও গরীবদের জন্যও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা হয়, অথচ ইসলামের ইতিহাসে গরীব ও আমীরের মাঝখানে যোগসূত্র রক্ষা ক- ইসলামের এই সব সূফীর খানকাহ্। এ সমস্ত বুযুর্গের দরবার সেই দরবার ছিল যেখানে সুলতানও খাজনা পাঠাতেন। স্বয়ং সাম্রাজ্যের যুবরাজ খিযির খান পর্যন্ত উক্ত দরবারের ভক্ত ও অনুরক্তদের অন্তর্গত ছিলেন। সুলতান 'আলাউদ্দীন যিনি সারা ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন—তাঁকেও রাজস্বের একটি অংশ এই বুযুর্গদেরকে প্রদান করতে হ'ত।[২] এই খানকাহ্‌রই মাধ্যমে দেশের গরীব ও দরিদ্র শ্রেণীর কাছে তাদের ন্যায্য হিস্যা পৌঁছে যেত।

"প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইসলামী রাজত্বের কোন একটি যুগ এবং সে সময়ে ভারতবর্ষের কোন একটি প্রদেশ ও অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ—

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৯৯ পৃ;

২. নিজামে তা'লীম, ২১৪ পৃ;

توخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

অর্থাৎ "ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে গ্রহণ কর এবং দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও" কার্যকরি করতে সত্যাশ্রয়ী ও সূফীদের এ সম্প্রদায় মশগুল ছিলেন না। বিশেষ করে যে সমস্ত বুযুর্গের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উপর তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম হ'ত তখন গরীব ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়ে যেত।[১] ইসলামের এই সমস্ত মনীষীর অবস্থা সম্পর্কে জানুন ও একবার চিন্তা করুন, দেখবেন, আমীর ও গরীবদের মাঝখানে ঐ সমস্ত মনীষী ও বুযুর্গের অস্তিত্ব ও সত্ত্বা এক সেতুবন্ধন হিসেবে বিরাজ করছে। দেশের ও রাষ্ট্রের গরীব, নিরাশ্রয় ও সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের এটা একটা আশ্রয় শিবির হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছিল; বরং এ সমস্ত খানকাহ্‌র মাধ্যমেই গরীব ও নিঃস্বদের কাছেও ঐ সমস্ত নিয়ামত পৌঁছে যেত যেগুলোর নাম তারা সম্ভবত শোনেওনি।"[২]

শায়খ (র)-এর খোরাক

শায়খ নিজেও খানায় শরীক হতেন, কিন্তু সেই শাহী-দস্তরখান যার উপর বিবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ও নিয়ামত ছড়ানো থাকত তাতে শরীক হতেন না, বরং তাঁর খোরাক ছিল সাধারণভাবে এক আধখানা রুটি, সবজী, ভাত, কিছু করেলা ইত্যাদি ।[৩]

নিয়ম-প্রণালী

দস্তরখানে বসবার কয়েকটি কানুন ও নিয়ম-প্রণালী এরূপ ছিল যে, সবার আগে মুরশিদ (র)-এর নিকটাত্মীয় হতেন, এরপর 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং এরপর অভিজাত মহল।[৪]

সমকালীন সুলতানের সাথে সম্পর্কহীনতা

চিশতীয়া সিলসিলার বুনিয়াদ ভারতবর্ষের গোটা সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনই নয় বরং ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সমাজ জীবনের সংস্কার ও সংশোধন এবং তন্মধ্যে রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) ও

১. ঐ. ২২০ পৃ;
২. সিয়ারুল আওলিয়া,পৃষ্ঠা ২২৮;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ পৃ;
৪. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০২ পৃ;

আল্লাহ্‌র সাথে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রাণ সঞ্চারের সাথে সাথে সে যুগের সুলতানদের সাথে সম্পর্কহীনতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এটা এ সিলসিলার একটি প্রতীক চিহ্ন ও চিশতীয়া তরীকার মাশায়িখে কিরামের পবিত্র উত্তরাধিকার ও আমানত হিসেবে পরিগণিত হ'ত। চিশতীয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরাম সীসার ন্যায় মযবুত, সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করার ব্যাপারে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেন। এক দিকে তাঁরা শাহী দরবারের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ প্রবণতা এবং যুগের বিভিন্ন ফেতনা-ফাসাদের উৎখাত সাধন করেন, অপরদিকে নীতি, আদর্শ ও 'আকীদার দিক দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্তও নেন যে, তাঁদের সরাসরি কোন সম্পর্ক শাহী কিংবা রাজদরবারের সাথে থাকবে না।

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) থেকে আরম্ভ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল যে, শাহী দরবারে যাওয়া যেমন চলবে না, ঠিক তেমনি যুগের যিনি সুলতান তাঁর সাথে মোলাকাত করতে যাওয়াও চলবে না। সবাই এ নীতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিলেন। এর পরিণতি হয়েছিল এইযে, রাজনীতির তিক্ত কাঁটা তাঁদের আঁচলে জড়িয়ে কখনও তাঁদেরকে বিব্রত করতে পারেনি এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্নমুখী বিপ্লব ও রাজবংশের উত্থান-পতন তাঁদের কেন্দ্রগুলিতে ও তৎপরতার মধ্যে কোনরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁদের একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা সকল প্রকার রাজনৈতিক বিভেদ ও বৈপরিত্য সত্ত্বেও সঠিক ও অব্যাহত থাকে এবং—এটারই কারণে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী এ সিলসিলার পক্ষে তাঁদের মিশন অব্যাহত রাখার ও ভারতবর্ষে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ মিলেছিল। সম্ভবত এরই পরিণতিতে এ সিলসিলা সাধারণ লোকসমাজে জনপ্রিয়তা ও চিরন্তনতা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (র) যখন থেকে শায়খুল কবীর (র)-এর দ্বারা ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে জয় করতে এবং তবলীগ ও হেদায়াতের জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন তারপর থেকে দিল্লীর সিংহাসনে একের পর এক পাঁচজন বাদশাহ অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁরা অত্যন্ত জাঁকজমক ও দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। কিন্তু মাত্র একবার ছাড়া এবং তাও ধর্মীয় প্রয়োজন হেতু (সামা 'হালাল অথবা হারাম সম্পর্কিত বাহাছে) আর কখনও শাহী দরবারে যান নি অথবা ত ৎকালীন বাদশাহদেরও কাউকে নিজ দরবারে আসার অনুমতি দেন নি। গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে তাঁর [শায়খ নিজাম (র)-এর] খ্যাতির দীপ্ত সূর্য ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা মাঝ-আকাশে উপনীত হয় নাই বিধায় সুলতান গিয়াছুদ্দীনের নজর তাঁর উপর পড়ে নাই। সুলতান মু'ইয্‌যুদ্দীন কায়কোবাদ খেলাধুলা, ক্রীড়া-কৌতুক, শিকার ও ভ্রমণেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন।

জালালুদ্দীন খিলজীই ছিলেন প্রথম বাদশাহ যিনি জ্ঞানী, দৃঢ়চেতা, সহিষ্ণু, প্রতিভা ও মনীষার সন্ধানলাভে সক্ষম এবং গুণী জনের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এ সময় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন কয়েকবার তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কখনও তা মঞ্জুরী লাভে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান আমীর খসরু (র)-এর সাথে (যিনি সুলতানের সভাকবি ও সেক্রেটারী ছিলেন) এমত পরিকল্পনা করেন যে, একবার আগমন সংবাদ না জানিয়েই হযরত শায়খ (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হবেন। আমীর খসরু (র) সমীচীন মনে করেন যে, স্বীয় মুরশিদকে এ সম্পর্কে অবগত করবেন। কেননা আমি তাঁকে বাদশাহ্র আগমন সংবাদ না দিলে সম্ভবত তা আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে না। যদিও এ ব্যাপারে বাদশাহ্ আমীর খসরু (র)-কে স্বীয় গোপন অভিসন্ধির অংশীদার বানিয়েছিলেন, তথাপি শায়খ ও মুরশিদের নিকট এ পরিকল্পনা ও অভিসন্ধি গোপন রাখা তাঁর নিকট সমীচীন মনে হয় নি। আমীর খসরু শায়খ খাজা নিজাম (র)-এর নিকট গিয়ে আরজ জানান যে, আগামী কাল বাদশাহ আপনার খেদমতে হাযির হবেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) একথা শোনা মাত্রই স্বীয় মুরশিদ শায়খুল কবীর (র)-এর কবর যিয়ারতের নিয়তে আজুদহন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। বাদশাহ যখন এ সংবাদ অবগত হন তখন তিনি আমীর খসরু-এর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন–যেহেতু আমীর খসরু (র) তাঁর গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন। আমীর খসরু এতে উত্তর দেন যে, বাদশাহ্র অসন্তুষ্টিতে জীবন হারাবার ভয় ছিল, কিন্তু মুরশিদ (র)-এর অসন্তুষ্টিতে ছিল ঈমান হারাবার ভয়। বাদশাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি এ উত্তর খুবই পসন্দ করেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যান।[১]

সুলতান আলাউদ্দীনের পরীক্ষা ও শ্রদ্ধা

সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজী যিনি প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ও সৌভাগ্যবান বাদশাহ ছিলেন যাঁকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারও বলা হয়– আপন চাচা সুলতান জালালুদীনের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রথম দিকে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও বীতরাগ বা শ্রদ্ধা ও ঘৃণা কোনটাই ছিল না। কেউ কেউ সুলতানকে হযরত খাজা (র) সম্পর্কে ভুল ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিল এবং তাঁর প্রতি ব্যাপক জনস্রোতের গতি ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যের জন্য বিপদজনক–এমত ধারণা সৃষ্টিরও প্রয়াস

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৩৬ পৃষ্ঠা;

চালিয়েছিল। সুলতান 'আলাউদ্দীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খেদমতে আপন পুত্র ও যুবরাজ খিযির খানের হাতে বিনীতভাবে লিখিত একটি দরখাস্ত পাঠান যার মধ্যে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ দেবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। যখন খিযির খান এই আবেদনপত্র নিয়ে খাজা (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি কাগজখানা হাতে নিয়েই এবং তা না পড়েই মজলিসে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি দু'আ' করছি।" এরপর তিনি বলেন, "দরবেশদের বাদশাহ্‌র সাথে কি কাজ? আমি একজন ফকীর মানুষ। শহরের এক কোণে পড়ে আছি। বাদশাহ এবং মুসলমানদের জন্য দু'আ প্রার্থনায় মশগুল। আর এজন্য যদি বাদশাহ্‌র কোনরূপ আপত্তি কিংবা অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ্‌র যমীন অত্যন্ত প্রশস্ত।" সুলতান 'আলাউদ্দীন এরূপ জবাবে অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন যে, আমি জানতাম যে, সাম্রাজ্যের কোন ব্যাপারে কিংবা রাজনীতিতে খাজা হযরত (র)-এর কোনরূপ যোগসূত্র নেই। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা চায় যে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের সাথে আমার টক্কর বাঁধুক এবং এভাবে রাষ্ট্র ও দেশ ধ্বংস হয়ে যাক।[১]

বাদশাহ্‌র আগমনের সংবাদে ওযরখাহী

সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজী সুলতানুল মাশায়িখের নিকট বহু অনুনয় বিনয় করেন এবং বলে পাঠান যে, "আমি হুযূরেরই একজন ভক্ত ও অনুরক্ত মাত্র, আমার অন্যায় ও বেয়াদবী হয়েছে। আমাকে যেন মাফ করা হয় এবং হাযির হবার এজাযত দেওয়া হয় যাতে কদমবুসি করবার সৌভাগ্য ঘটে।" হযরত খাজা (র) বলেন যে, "আসবার প্রয়োজন নেই। আমি দূরে থেকেই দু'আ করছি। আর দূরের দু'আ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে থাকে।[২]

ঘরের দু'টো দরজা

সুলতান এরপরও সাক্ষাত লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এতে হযরত বলেন যে, "এ ফকীরের ঘরে দু'টো দরজা। বাদশাহ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন আর আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৩৪ পৃ;

২. ঐ, ১৩৫ পৃ;

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৩৫. পৃ;

ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা

যদিও সুলতান 'আলাউদ্দীনের হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নাই, তথাপি তাঁর প্রতি সুলতানের ভক্তি-শ্রদ্ধা বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তথা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত খাজা (র)-এর মুখাপেক্ষী হতেন। এক্ষেত্রে সুলতান দু'আ'র দরখাস্ত পেশ করতেন এবং তিনি আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সাথে দু'আ করতেন।

কাযী যিয়াউদ্দীন বার্নী বলেন যে, যখন মালিক নায়েব (মালিক কাফূর) বিরঙ্গীলের অবরোধে ব্যস্ত তখন তেলেঙ্গানার রাস্তা বিপদপূর্ণ হয়ে যায়। রাস্তায় অবস্থিত থানা ও ফাঁড়িগুলোও উঠে যায়। চল্লিশ দিনেরও বেশী হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তা ও মঙ্গলজনক কোন খবরই সুলতানের নিকট পৌঁছুচ্ছিল না। সুলতান ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। দরবারের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গ আশংকা প্রকাশ করছিলেন হয়ত-বা সৈন্যবাহিনী কোন দৈব-দুর্বিপাকের শিকারে পরিণত হয়েছে, ফলে রসদপত্র ও চিঠিপত্রাদির যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গেছে। এরূপ চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কালেই একদিন সুলতান মালিক কারা বেগ এবং কাযী মুগীছুদ্দীন বিয়ানুবীকে হযরত খাজা (র)-এর খেদমতে পাঠান এবং বলে দেন যে, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলামঙ্গলের কোন খবর না পেয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও দরদ-অনুভূতি আমার চেয়েও আপনার অনেক বেশী। আপনি যদি বাতেনী চোখের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীর কোনরূপ অবস্থা অবগত হন তাহলে আমাকে তা জানিয়ে নিশ্চিন্ত ও খুশী করবেন। সুলতান পয়গামবাহীদের হেদায়াত করে দেন যে, ঐ মুহূর্তে হযরতের মুখ দিয়ে যাই বেরুবে তা সঙ্গে সঙ্গে হেফাজত করবে এবং এর মধ্যে যেন কোন কম-বেশী না করা হয় এবং সুলতানের প্রেরিত পয়গাম পৌঁছায়। তিনি পয়গাম শোনা মাত্রই বাদশাহ্র বিজয়ের বর্ণনা দিতে শুরু করেন এবং বলেন, "এটা তো সামান্য ও নগন্য বিজয়। আমরা আরও বড় বিজয়ের আশা রাখি।" একথা শুনে মালিক কারা বেগ ও কাযী মুগীছুদ্দীন অত্যন্ত খুশী মনে ফিরে আসেন এবং সুলতানকে ঐ সুসংবাদ দেন। সুলতান তা শুনে অত্যন্ত খুশী হন। তিনি স্থির নিশ্চিত হন যে, বিরঙ্গীলের বিজয় হয়ে গেছে। ঐ দিন সালাতুল আসর সম্পন্ন করার অব্যবহিত পরই মালিক কাফুরের দূত এসে পৌঁছে এবং বিরঙ্গীলের বিজয়ের সংবাদ ব্যক্ত করে। জুমু'আর দিন বিজয়-পত্র মসজিদের মিম্বর থেকে পড়ে শোনানো হয়। প্রাঙ্গণে খুশীর কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকে এবং আনন্দ-উৎসবের ধুম লেগে যায়।[১]

---

১. তারীখে ফীরূযশাহী, ৩৩৩পৃ:।

আরও একবার যখন মোগলরা দিল্লী আক্রমণোদ্যত হয়েছিল তখন সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত খাজা (র)-এর খেদমতে আরয করেন, "এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক মুহূর্ত। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন।" এরপর হযরত খাজা নিজাম (র) সমস্ত খানকাহ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, "আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ কর এবং তাঁরই দরগাহে মুসলমানদের জয়লাভের জন্য দু'আ করতে থাক।" এরপর সবাই দু'আ ও মুনাজাতে মগ্ন হয়ে যায় এবং অল্প কিছু পরেই বিজয়ের খবর এসে পৌছে। মোগলরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।[১]

কাযী যিয়াউদ্দীন সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজদরবারের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। তিনি বলেন যে, সুলতানের গোটা রাজত্বকালে তাঁর মুখ দিয়ে হযরত খাজা (র)-এর শানে কোন অমর্যাদাকর উক্তি কখনই বের হয়নি। যদিও দুশমন ও হিংসুটে স্বভাবের লোকেরা শায়খ (র)-এর শাহী জাঁকজমক ও খানকাহমুখী জনস্রোত ও শাহী লঙ্গরখানার মত ব্যাপক ও বিস্তৃত কাণ্ডকারখানাকে সুলতানের চোখে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলতে কল্পনার রঙ মিশ্রিত এমন সব পন্থা-পদ্ধতি এখতিয়ার করত যাতে সুলতানের শায়খ (র)-এর প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। সুলতান কিন্তু কখনও সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করেননি। বিশেষ করে রাজত্বের শেষ দিকে তিনি হযরতের প্রতি মাত্রাধিক পরিমাণে একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন।

সুলতান কুত্বুদ্দীনের বিরোধিতা ও হত্যা

সুলতান 'আলাউদ্দীনের পর সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র কুত্বুদ্দীন মুবারক শাহ সাম্রাজ্যের যুবরাজ খিযির খানকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খিযির খান যেহেতু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মুরীদ ছিলেন এবং তিনিই (খিযির খান) মরহুম সুলতান 'আলাউদ্দীন আওলিয়ার সিংহাসনের ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন–যাঁর নিকট থেকে কুত্বুদ্দীন মুবারক শাহ ক্ষমতার মসনদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন–সেহেতু কুত্বুদ্দীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর প্রতি সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকতেন। সুলতান "জামে মীরি" নামে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সকল বুযুর্গ ও 'উলামায়ে কিরামের উপর নির্দেশ ছিল যেন তাঁরা সেখানে গিয়ে সালাতু'ল-জুম'আ আদায় করেন। সুলতানুল মাশায়িখ বলে পাঠান যে, "আমাদের কাছেই একটি মসজিদ আছে। তার হক

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ১৬০।

বেশী বিধায় আমরা সেখানেই সালাত আদায় করব।" তিনি অতঃপর জামে' মীরিতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। এতে বাদশাহ্ ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। উপরন্তু প্রতি চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে আত্মীয়-বান্ধব ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শাহী দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ্র খেদমতে নযরানা পেশ করত। সুলতানুল মাশায়িখ এ অনুষ্ঠানেও শরীক হতেন না, প্রথা মাফিক রসম পালনের উদ্দেশ্যে স্বীয় খাদেম ইকবালকে পাঠিয়ে দিতেন। এতে সুলতান আরো বিগড়ে যান। তিনি তাঁর সমস্ত উযীর ও আমীর-উমারাকে নির্দেশ দেন কেউ যেন হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে গিয়াছপুর না যায়। আমীর খসরু (র) লিখেছেন যে, বাদশাহ্র নির্দেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি শায়খের মাথা আনবে তাকে হাযার তংকা বখশিশ দেওয়া হবে।

একদিন শায়খ যিয়াউদ্দীন রুমীর দরবারে সুলতান কুতবুদ্দীন এবং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) সামনাসামনি হয়ে যান। শায়খ একজন মুসলমান হিসেবে সুলতানকে সালাম জানান। সুলতান কুত্বুদ্দীন জবাবদানে বিরত থাকেন। এধরনের ঘটনাবলী চার বছরের শাসনামলে পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে।[১] চান্দ্র মাসের প্রথম তারিখের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির ব্যাপারে পীড়াপীড়ির ঘটনা সবশেষে ঘটেছিল।

যাই হোক, অবশেষে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খসরু খান কর্তৃক নিহত হবার পর এই বিরোধিতার অবসান ঘটে।

গায়েবী লঙ্গরখানা

ঐ যুগেই সুলতান কুত্বুদ্দীনের তরফ থেকে এব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল যে, দরবারের কোন আমীর-উমারা এবং সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে যেন কোনরূপ নযরানা হযরত খাজা (র)-এর খেদমতে না যায়। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া এটা জানবার পর বিশেষভাবে তাকিদ দেন যেন পূর্বের তুলনায় বেশী করে খানা পাকানো হয় এবং দস্তরখানের পরিধি আরও অধিক প্রসারিত করা হয়। হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) বলেন ঃ

"একবার সুলতান কুত্বুদ্দীনকে কোন হিংসুটে বলে যে, শায়খ আমাদের হাদিয়া-নযরানা কবুল করেন না অথচ আমীর-উমারা ও সরদারদের আনীত

---

১. নিজামে তা'লীম, পৃষ্ঠা ২২০;

নযরানা কবুল করেন। সুলতান কুত্‌বুদ্দীন এর সত্যতা অবহিত হবার পর নির্দেশ পাঠান যে, কোন আমীর অথবা সরদার শায়খ (র)-এর ওখানে যাবে না। দেখি, তিনি এত পরিমাণ লোকের দাওয়াত কোথা থেকে করেন। অধিকন্তু তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। তাদের উপর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল যেন তারা কোন আমীর খাজা (র)-এর দরবারে গেলে তা লক্ষ্য রাখে এবং যথাসময়ে গিয়ে বাদশাহ্‌কে অবহিত করে। হযরত শায়খ (র) একথা শোনার পর বলেন, আজ থেকে খাবার বেশী করে পাক করা হোক। বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর একদিন বাদশাহ্ লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন, শায়খের খানকাহ্‌র অবস্থা কি? তারা বলল যে, আগে যে পরিমাণ পাক করা হ'ত বর্তমানে তার দ্বিগুণ পাক করা হয়ে থাকে। একথা শোনার পর বাদশাহ অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমিই ভুলের মধ্যে ছিলাম। তাঁর কারবারই তো গায়েবী জগতের সঙ্গে।"[১]

গিয়াছুদ্দীন তুগলকের রাজত্বকাল এবং সরকারী বিতর্ক সভা

কুত্‌বুদ্দীন মুবারক শাহ্‌র পর কয়েক মাস খসরু খান অন্যায় ও যবরদস্তিমূলকভাবে রাজত্ব করেন এবং ইসলামী প্রথা-পদ্ধতিকে হেয় করে ইসলামেরই অবমাননা করেন। ৭২১ হিজরীতে গিয়াছুদ্দীন তুগলক (মালিক গাযী) খসরু খানকে হত্যা করে তুগলক বংশের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান গিয়াছুদ্দীন যদিও তেমন বিদ্যাবত্তার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু 'আলিম-'উলামা ও শরীয়তের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) সামা শুনতেন। একারণে দিল্লীর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং জনগণের আগ্রহ এর প্রতি বৃদ্ধি পায়।[২] শায়খযাদা হুস্‌সামুদ্দীন ফারজাম নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবত হযরত নিজামুদ্দীন (র)-এর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছিল, তথাপি মুজাহাদার গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং 'ইশ্‌কের অমূল্য নিয়ামত ও সম্পদ থেকে সে লাভবান হতে পারেনি। অধিকন্তু সাম্রাজ্যের উপ-শাসক কাযী জালালুদ্দীন আলুয়ালজীরও আহলে দর্দ ও 'ইশ্‌ক (মা'রিফতপন্থী)দের প্রতি এক ধরনের বিদ্বিষ্ট মনোভাব ছিল। কাযী সাহেব এবং অন্যান্য 'উলামায়ে কিরাম শায়খযাদা হুস্‌সামুদ্দীনকে নিজেদের মতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল এবং সে বাদশাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই বলে যে, খাজা নিজামুদ্দীন এ যুগের ইমাম। অথচ তিনি সামা শোনেন যা ইমাম আ'জম আবূ হানীফার মাযহাব মতে হারাম। তাঁরই কারণে হাযার হাযার

১. খায়রুল মাজালিস, পৃষ্ঠা ২০৩;

২. সামা'র হাকীকত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এর আদব ও আহকাম সম্পর্কিত বাহাছ চতুর্থ অধ্যায়ে "স্বাদ ও বিভিন্ন অবস্থা" দেখুন।

আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এই অপ্রিয় ও নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত হচ্ছে। এ মসলা সম্পর্কে সুলতান ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর। তাঁর আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে, এতবড় একজন ইমাম এরূপ শরীয়ত-বিগর্হিত কর্মে লিপ্ত! লোকেরা সামা' হালাল হবার ফতওয়া এবং শরীয়তের কিতাবসমুহের বিভিন্ন রেওয়ায়েত বাদশাহ্‌র সামনে পেশ করে। বাদশাহ বললেন যে, যেহেতু 'উলামায়ে দীন সামা'র হারাম হবার সপক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁরা একে নিষেধ করে থাকেন সেহেতু হযরত খাজা (র) এবং শহরের সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আহবান করা হোক। অতঃপর একটি জলসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি ফয়সালা করা হোক প্রকৃত সত্য কোন্‌টি। মীর খোরদের ভাষায় শুনুনঃ

"শাহী-প্রাসাদে হযরত খাজা (র)-কে আহবান জানানো হল। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) কাযী মুহীউদ্দীন কাশানী ও মাওলানা ফখরুদ্দীন নামক দু'জন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও যুগশিক্ষক সমভিব্যাহারে শাহী প্রাসাদে তশরীফ আনেন। সর্বপ্রথম উপ-শাসক কাযী জালালুদ্দীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)কে সম্বোধন করে ওয়াজ-নসীহত শুরু করেন এবং কিছু অশোভনমূলক উক্তি করেন। এমন কি এও বলেন যে, যদি এরপরও আপনি সামা'র হালাল হবার দাবি অব্যাহত রাখেন এবং তা শুনতে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন, শরা'র হাকীম হিসেবে আমি আপনাকে শাস্তি দেব। একথা শুনতেই হযরত খাজা (র) বলে ওঠেন, যে পদের গর্বে গর্বিত হয়ে তুমি আজ এই কথা বলছ, তা থেকে তুমি অপসারিত হবে। অতঃপর এর ঠিক বার দিন পর কাযী স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়ে দিল্লী থেকে বিদায় নেন। সংক্ষেপে ঘটনা এই যে, উক্ত বিতর্ক মজলিসে সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমীর-উমারা ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ এবং উপস্থিত সকলেরই হযরত খাজা (র)-এর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সকলেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। শায়খযাদা হুস্‌সাম তখন বললেন, আপনার মজলিসে সামা হয়ে থাকে, লোকেরা নৃত্য করে এবং আহ্ উহ্ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। তিনি এ ধরনের অনেক কথা বললেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চেঁচিও না, বেশী কথা বলার দরকার নেই। আগে বল যে, সামা'র সংজ্ঞা কি? প্রত্যুত্তরে শায়খযাদা হুস্‌সাম লজ্জিত হন। বাদশাহ গভীর আগ্রহের সাথে তাঁর তাকরীর (বক্তৃতা) শুনছিলেন। যখনই কেউ জোরে কথা বলতে চেষ্টা করত তখনই তিনি বলতেন, চেঁচিও না। শোন, শায়খ (র) কি বলছেন। মজলিসে উপস্থিত 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে মাওলানা হামীদুদ্দীন এবং মাওলানা শিহাবুদ্দীন মুলতানী নিশ্চুপ ছিলেন। মাওলানা হামীদুদ্দীন এতটুকু বললেন যে, বাদী হযরত খাজা (র)-এর মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিলেন তা

ঘটনার বিপরীত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। আমি নিজে দেখেছি এবং বহু বুযুর্গ ও দরবেশকেও আমি সেখানে দেখেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র)-এর দৌহিত্র মাওলানা 'আলামুদ্দীন এসে উপস্থিত হন। বাদশাহ তাঁকে বললেন যে, আপনি একজন 'আলিম এবং পর্যটকও বটেন। এক্ষণে সামা' নিয়ে বাহাছ হচ্ছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, সামা শ্রবণ হালাল, না হারাম? মাওলানা 'আলামুদ্দীন বললেন, আমি এ সম্পর্কে একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেছি এবং সেখানে এর হারাম ও হালাল হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণও উপস্থাপিত করেছি। আমার গভীর পর্যবেক্ষণের ফলাফল এই যে, যে হৃদয় দিয়ে শোনে তার জন্য সামা হালাল, আর যে ব্যক্তি নফস (রিপু, প্রবৃত্তি)-এর সাহায্যে শোনে তার জন্য এটা হারাম। এরপর বাদশাহ মাওলানা 'আলামুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি বাগদাদ, শাম (সিরিয়া), তুরস্ক প্রভৃতি শহরসহ সর্বত্রই প্রায় ভ্রমণ করেছেন। সেখানকার বুযুর্গ ও মাশায়িখে কিরাম সামা শোনেন কিনা ? সেখানে কি কেউ কাউকে তা শুনতে মানা করে ? মাওলানা 'আলামুদ্দীন উত্তরে বললেন যে, ঐ সমস্ত শহরে বুযুর্গ ও মাশায়িখে কিরাম সামা' শুনে থাকেন। আর কেউ কেউ তো দফ ও শাবানা সহকারে তা শোনেন, কেউ মানা করে না। আর সামা তো মাশায়িখে কিরামের মধ্যে হযরত জুনায়দ (র), হযরত শিবলী (র)-এর সময় থেকেই চলে আসছে। বাদশাহ মাওলানা 'আলামুদ্দীনের মুখের এমত বর্ণনা শোনার পর নিশ্চুপ হয়ে যান এবং আর কিছুই বলেন নি। মাওলানা জালালুদ্দীন আরয করেন যে, বাদশাহ যেন সামা হারাম হবার ফরমান জারি করেন এবং ইমাম আ'জম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বাদশাহকে বলেন, আমি চাই যে, আপনি এ ব্যাপারে কোন ফরমান যেন জারি না করেন এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ ফয়সালা পেশ করা থেকে বিরত থাকেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন (যিনি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন)-এর বর্ণনা এই যে, চাশতের প্রথম ওয়াক্ত থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত বাহাছ অব্যাহত থাকে। মজলিসে উপস্থিত কোন ব্যক্তিই এর হারাম হবার সপক্ষে দলীল পেশ করতে পারে নি। অপর একটি বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, বাদশাহ ফয়সালা করেন যে, হযরত খাজা (র) সামা 'শুনতে পারেন, কেউ এ থেকে তাঁকে নিষেধ করতে পারবে না। কিন্তু এ বর্ণনাটি পরিত্যক্ত। ঐ দিনগুলোতে কেউ হযরত খাজা (র)-কে বলেন যে, এখন তো সামা'র সপক্ষে বাদশাহ্‌র ফরমান মিলে গেছে। যে সময় যে মুহূর্তে চাইবেন, সামা' শুনবেন। এটা তো হালাল হয়ে গেছে। হযরত খাজা (র) বললেন, যদি তা হারাম হয় তবে কারো বলায় তা হালাল হতে পারে না। আর যদি হালাল হয় তবে কারো বলায়

সমাপ্তির পর বাদশাহ হযরত খাজা (র)-কে অত্যন্ত তা'জীম ও তাকরীমের সঙ্গে বিদায় দেন।[১]

হযরত খাজা (র)-এর যবানীতে বির্তক সভার অবস্থা

কাযী যিয়াউদ্দীন বার্নী স্বীয় গ্রন্থ "হাসরতনামায়" লিখেন যে, হযরত খাজা (র) উক্ত মজলিস থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে তশরীফ আনেন এবং জোহরের ওয়াক্তে মাওলানা মুহীউদ্দীন কাশানী আমীর খসরুকে ডেকে পাঠান। তিনি ইরশাদ করেন যে, দিল্লীর 'উলামাদের অন্তর হিংসা ও দুশমনীতে ভরা। তারা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ময়দান পেয়েছে এবং শত্রুতামূলক বহু কথাবার্তা বলেছে। সব চেয়ে এটাই আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম যে, সহীহ হাদীছ শোনাটা পর্যন্ত এরা মেনে নিতে পারছে না! এর জবাবে তারা এটাই বলে যে, আমাদের শহরে হাদীছের তুলনায় ফিকাহ্ই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ কথা শুধু সে-ই বলতে পারে যার হাদীসে নববী (সা)-এর উপর আদৌ কোন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। আমি যখনই কোন সহীহ হাদীছ পড়তে থাকি তখনই তারা নারায হয়ে বলে যে, এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফি'ই দলীল দিয়ে থাকেন এবং তিনি আমাদের 'উলামাদের দুশমন বিধায় আমরা তা শুনব না। জানি না এদের আদৌ কোন 'আকীদা আছে কিনা। এরা শাসকের (উলূ'ল-আমর) সামনে এরূপ যবরদস্তিমূলকভাবে কাজ-কারবার করে এবং সহীহ হাদীসের পাঠকে থামিয়ে দেয়। এমন 'আলিম আমি দেখিও নি আর এ ধরনের 'আলিমের কথা শুনিওনি যে, তার সামনে সহীহ হাদীস পাঠ করা হয় অথচ সে বলে যে, আমি শুনব না। আমি বুঝতে পারি না যে, আসলে রহস্যটা কি। আর যে শহরে এরূপ ধৃষ্টতা ও যবরদস্তি দেখানো হয়, সে শহর কি করে টিকে থাকতে পারে! এর প্রতিটি দালান-কোঠার ইট-কাঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও তা মোটেই তাজ্জবের ব্যাপার হবে না। এরপর বাদশাহ, আমীর-উমারা এবং সাধারণ জনগণ শহরের কাযী ও 'উলামাদের থেকে এটা শুনবে যে, এই শহরে হাদীসের উপর 'আমল করা হয় না। তা'হলে হাদীসে নববী (সা)-এর উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা কি করে থাকবে? আমার ভয় হয় যে, না জানি 'উলামাদের এধরনের অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবীর কারণে আসমান থেকে কোন বালা-মুসীবত, দূর্ভিক্ষ ও মহামারী অবতীর্ণ হয়।[২]

দিল্লীর ধ্বংস

এই ঘটনার ঠিক ষষ্ঠ বছরে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর ওফাতের পর সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ তুগলক

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ৫২৭-৩২;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫২৭ পৃ;

দিল্লী খালি করার এবং দেবগীরে (দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরের ফরমান জারি করেন এবং এব্যাপারে এরূপ জিদ ও ক্ষিপ্ততার আশ্রয় নেন যে, বাস্তবে শহরের প্রতিটি ইট ঝনঝনিয়ে ওঠে এবং দিল্লীর মত কোলাহলমুখর একটি শহর, ঘনবসতির কারণে যেখানে লোকের থাকার জায়গা পাওয়া যেত না, এমনভাবে জনশূন্য হয়ে পড়ে যে, বন্য পশু ও হিংস্র প্রাণী ব্যতিরেকে কোন জীবিত প্রাণীর চেহারা পর্যন্ত সেখানে দৃষ্টিগোচর হ'ত না।

মুহাম্মদ কাসিম 'তারীখে ফিরিশতায়' লিখেন যে, সরকারী কর্মকর্তারা একটি লোককেও দিল্লীর আলো-বাতাস তিষ্ঠোতে দেয়নি, সবাইকে জড়ে-মূলে দৌলতাবাদ (দেবগীর) পাঠিয়ে দেয়। ফলে দিল্লী এমনভাবে বিরান ও জনশূন্য হয়ে পড়ে যে, একমাত্র শকুন, শিয়াল ও বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন জীবজন্তু কিংবা জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দও সেখানে পাওয়া যেত না।[১]

যে সমস্ত 'উলামা উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্যরাও তাদের বদৌলতে দৌলতাবাদে নির্বাসিত হন। দৌলতাবাদ পৌঁছার পর সেখানকার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মুকাবিলা করতে হয়। হাযার হাযার নর-নারী তো রাস্তাতেই মারা যায়। হাযার হাযার সেখানে পৌঁছা মাত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকারে পরিণত হয়। আর এভাবে হযরত খাজা (র)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

সময়ের ব্যবস্থাপনা

আমীর খোরদ হযরত খাজা (র)-এর সময়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখেছেন যে, "প্রতিদিন ইফতারের পর (যা আহলে জামা'আতের সাথেই হ'ত) স্বীয় বালাখানার বিশ্রামস্থলে তশরীফ নিতেন। বন্ধু-বান্ধব ও সেবকবৃন্দ যারা সাধারণত শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত–মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তাদেরকে প্রাসাদের উপরেই ডেকে পাঠানো হ'ত। প্রায় এক ঘন্টাকাল সময় পারস্পরিক সহাবস্থান, সান্নিধ্য ও সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ঘটত। বিভিন্ন রকমের শুকনো ও তাজা ফুল-মূলাদি, সুস্বাদু ও রুচিকর খাবার এবং নানা প্রকার পানীয় দ্রব্যাদি হাযির করা হ'ত। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এসব গ্রহণ করত। তিনি প্রত্যেকের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করতেন এবং প্রত্যেকের শুভাশুভ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।"[২]

১. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃ.;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ পৃষ্ঠা;

আমীর খসরুর বৈশিষ্ট্য

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) 'ইশার সালাত সম্পাদনের জন্য অতঃপর নীচে অবতরণ করতেন। জামাতের সাথে সালাত আদায়ের পর পুনরায় প্রাসাদে তশরীফ রাখতেন। কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন, অতঃপর আরাম ও বিশ্রাম সুখ ভোগ করবার জন্য চারপায়ীর উপর শরীর এলিয়ে দিতেন। সে সময় খাদেম তসবীহ্ এনে হযরত খাজা (র)-এর হাতে উঠিয়ে দিতেন। এই সময় একমাত্র আমীর খসরু ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসতে সাহস পেত না।[১] তিনি হযরত খাজা (র)-এর সামনে বসে নানা ধরনের কাহিনী ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি খোশমেযাজে থাকা অবস্থায় মাথা নেড়ে দিতেন। সময়ে অসময়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, তুর্ক! কি খবর ? আমীর খসরু এতটুকু শোনা মাত্রই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মওকা বের করে নিতেন। তিনি একটু সূত্রের উল্লেখ করতেই আমীর খসরু গোটা ফিরিস্তিই পেশ করে দিতেন।

রাত্রের প্রস্তুতি

যখন আমীর খসরু এবং সাহেবযাদাগণ অনুমতি নেবার পর বিদায় হতেন তখন খাদেম ইকবাল এসে পানি ভর্তি কয়েকটি পাত্র ওযূর জন্য রেখে দিয়ে বাইরে চলে যেত। এরপর হযরত খাজা (র) স্বয়ং উঠতেন এবং দরজায় শেকল লাগিয়ে দিতেন। তারপর সেখানকার খবর একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহই জানেন যে, সারা রাত ধরে একান্তে ও নিভৃতে কি সব গোপন আলাপ হ'ত এবং স্বীয় মহান প্রভূ-প্রতিপালকের সাথে কি গভীর আকুতি ও অনুরাগের কথা হ'ত।

সাহরী

সাহরীর ওয়াক্ত হলে খাদেম এসে হাযির হত এবং বাইরে থেকে দরজায় নক্ (দস্তক) করত। হযরত খাজা (র) দরজা খুলে দিতেন। সাহরী-যার ভিতর

---

১. হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর সঙ্গে আমীর খসরুর যে গভীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা তার জীবন-চরিত ও দীওয়ান পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফুলের সাথে বুলবুলের যে সম্পর্ক এবং আগুনের সাথে পতঙ্গের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে ঠিক তেমনি সম্পর্ক ছিল আমীর খসরুর স্বীয় মুরশিদ হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে। হযরত খাজা (র)-এরও এই সত্যিকার ও খাঁটি 'আশিকের সাথে এতখানি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে, তিনি বলতেন,

من ازهمه تنگ ایم و از تو تنگ نیایم

অর্থাৎ কখনো কোন মুহূর্তে উদাস, নিঃসঙ্গ ও বিরক্ত বোধ করি কিন্তু এমতাবস্তায়ও তোমার সাথে তা হয় না। আরও একবার তিনি বলেছিলেন, "কখনও কখনও নিজেকেও নিজের কাছে বিরক্তিকর ও অসহ্য লাগে, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা মনে হয় না।" (সিয়ারুল আওলিয়া , ৩০২ পৃষ্ঠা)।

রকমারী খাদ্যদ্রব্য থাকত–সামনে রাখা হ'ত। তিনি এথেকে খুব অল্প পরিমাণেই গ্রহণ করতেন। অবশিষ্ট অংশটুকুর জন্য বলতেন যে, এগুলো বাচ্চাদের জন্য হেফাজতে রেখে দাও। খাজা 'আবদুর রহীম যিনি সাহরী নিয়ে যাবার দায়িত্বে ছিলেন, বলেন, অধিকাংশ সময়ই এমন হ'ত যে, তিনি সাহরী গ্রহণ করতেন না। আমি আরয করতাম, হযরত! এমনিতেই ইফতারীর মুহূর্তেও আপনি খুব কমই খান। যদি সাহরীও কিছু গ্রহণ না করেন তবে শারীরিক দূর্বলতা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। একথা শোনা মাত্রই তিনি কাঁদতে থাকতেন এবং বলতেন যে, কত গরীব ও অসহায় মসজিদের কোণায় ও চত্বরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে আছে, অনাহারে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় এ খানা আমি কিভাবে গলাধঃকরণ করতে পারি। অধিকাংশ সময় তাই দেখা গেছে যে, সাহরীর সময় যা এনেছি তাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছি।

ভোর বেলায়

দিনের বেলায় যারই দৃষ্টি তাঁর চেহারা মুবারকের উপর পড়ত সেই দেখতে পেত প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়িসদৃশ একটি চেহারা, আর চোখ সারা রাত বিনিদ্র যাপনের কারণে লাল। এরূপ কঠোর মুজাহাদা সত্ত্বেও তাঁর ভেতর কখনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হ'ত না কিংবা তাঁর স্বাভাবিক আচার-আচরণে কোনরূপ পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হ'ত না। কেউ বলতেও পারত না যে, তিনি চারশ' অথবা পাঁচ শ' রাকাত সালাত আদায় করতেন কিংবা তিনি এই পরিমাণ তসবীহ পাঠে অভ্যস্ত। তাঁর জীবন ও যিন্দেগী এভাবে কাটত যে, সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ অবহিত ছিল না।

দিনের বেলায়

প্রত্যহ দিনের বেলা তিনি স্বীয় মাশায়িখের মুসাল্লার (জায়নামায) উপর কেবলামুখী হয়ে গভীর আত্মনিমগ্নতার ভেতর অতিবাহিত করতেন যেন তিনি আল্লাহ্কে দেখছেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকই থাকত। 'উলামায়ে কিরাম, মাশায়িখ, শ্রদ্ধেয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ইতর-ভদ্র প্রত্যেকের বিদ্যা-বুদ্ধি ও মর্যাদা মুতাবিক যার যে বিষয় সেই বিষয়েই তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং তার সন্তুষ্টি সাধন করতেন। বাহ্যত তিনি তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তিনি মশগুল থাকতেন স্বীয় পরম আরাধ্য পেমাস্পদকে নিয়ে।[১]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ ও ১২৯ পৃষ্ঠা;

মনস্তুষ্টি সাধন ও প্রশিক্ষণ

জোহ্‌রের ওয়াক্ত হ'ত। সালাত আদায়ের পর যে সমস্ত আত্মীয়-বান্ধব কদমবুসির জন্য আসত, তাদেরকে আহ্বান করা হ'ত এবং তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের কথাবার্তায় তিনি কিছু সময় অতিবাহিত করতেন।'ইবাদত-বন্দেগী, সলূক ও আল্লাহ্‌র মুহব্বত সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিতেন। যবরদস্ত 'আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তিরও (যারা সে মজলিসে উপস্থিত থাকতেন) সাহস হ'ত না যে, মাথা উঁচিয়ে তাঁর চেহারা মুবারকের প্রতি লক্ষ্য করবে। এটাই ছিল আল্লাহ্-প্রদত্ত তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার প্রকাশ।

ওফাত নিকটবর্তী হ'লে

বয়স আশি বছর অতিক্রান্ত হতেই তাঁর মধ্যে পরলোক যাত্রার সমূহ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। একদিন তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূলে মকবুল (স)-কে দেখলাম। হুযুর (স) বললেন, "নিজাম! তোমার সান্নিধ্য আমি গভীর ভাবে কামনা করছি।"[১]

মর্যাদাশীল খলীফাদের এজাযতনামা প্রদান, মুহব্বত ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব

রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি কতিপয় হযরতকে খিলাফতনামা প্রদান করেন এবং এজাযতনামা লিখে দেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবী বিষয়বস্তু রচনা করেন এবং সাইয়্যেদ হুসায়ন কিরমানী তা লিপিবদ্ধ করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এর উপর দস্তখত করেন। দস্তখতের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

من الفقير محمد ابن احمد ابن على ا لبداؤنى البخارى

'দীনাতিদীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে 'আলী আল-বাদায়ূনী আল-বুখারীর পক্ষ থেকে।' এই এজাযতনামার উপর ৭২৪ হিজরীর ২০শে যিলহজ্জ তারিখের উল্লেখ ছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এটা ওফাতের তিন মাস ২৭ দিন পূর্বে লেখা হয়েছিল।[২]

যে সমস্ত মহাত্মার জন্য এই এজাযতনামা প্রস্তুত করা হয়েছিল তা তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত মহাত্মা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন তাঁদের হাতে তা প্রদান করা হয়। প্রথমে শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ারকে আহ্বান

১. ঐ, ১৪১ পৃষ্ঠা ;
২. হযরত খাজা (র)-এর ওফাত হয় ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউছছানী মাসে।

করা হয়। সুলতানুল মাশায়িখ (র) তাঁকে খিলাফতনামা প্রদান করেন। ইরশাদ হ'ল, যাও! এর শুকরিয়া স্বরূপ দু'রাকাত শোকরানা সালাত আদায় কর। বন্ধু-বান্ধব তাঁকে মুবারকবাদ জানান। এ সময়েই শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দিল্লীকে তিনি স্মরণ করেন। তাঁকেও খিরকা, খিলাফত ও এজাযতনামা প্রদান করেন এবং ওসিয়ত করেন। শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দিল্লী কেবলই দাঁড়িয়েছেন এমনি সময়ে শায়খ কুতবুদ্দীন মুনাওয়ারকে পুনরায় ডাকা হয়। তিনি এলে হযরত খাজা (র) ইরশাদ করেন–শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদের খিলাফত প্রাপ্তিতে তাঁকে মুবারকবাদ জানাও। অনুরূপ আদেশ শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদের প্রতিও করা হয়। অতঃপর উভয়েই উভয়ের খিলাফত প্রাপ্তিতে পরস্পরকে মুবারকবাদ জানান এবং একে অপরে কোলাকুলি করার আদেশ প্রাপ্ত হন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) অতঃপর বলেন, তোমরা উভয়ে পরস্পরের ভাই। কে আগে খিলাফত পেলে আর কে পরে পেলে এ নিয়ে মনে কিছু করবে না।[১]

ওফাতের অবস্থা

ওফাতের ৪০ দিন পূর্বে ইস্তিগরাক ও আশ্চর্যজনক এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমীর খোরদ ওফাতের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমু'আর দিন। সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর উপর এক অত্যাশ্চর্য অবস্থা বিরাজ করছিল। নূরে তাজাল্লী দ্বারা তাঁর অভ্যন্তরীণ ভাগ উজ্জ্বল ও আলোকিত মনে হচ্ছিল। সালাতের ভেতর বারবার সিজদা দিচ্ছিলেন। এরূপ অদ্ভুত আশ্চর্যজনক অবস্থার ভেতর দিয়ে তিনি ঘরে তশরীফ নেন। কান্নার বেগ বাড়তে থাকে। প্রত্যহ বার কয়েক বেহুঁশ ও ইস্তিগরাকের হালতে পৌঁছে যান। আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হন। বলতে থাকেন যে, আজ জুমু'আর দিন; দোস্ত তার দোস্তের ওয়াদার কথা স্মরণে আনছে। এরপরই তিনি আপন ভুবনে ডুবে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়ও তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন–সালাতের ওয়াক্ত কি হয়ে গেছে? আমি কি সালাত আদায় করেছি? যদি জওয়াব হ'ত যে, আপনি সালাত আদায় করেছেন, তখন বলতেন, আবারও পড়ে নিই। এভাবেই প্রতিটি ওয়াক্তের সালাতই তিনি দু'বার পড়তেন। যতদিন তিনি এরূপ অবস্থায় ছিলেন ততদিন এই দু'টি কথারই পুনরাবৃত্তি করতেন, 'আজ জুমু'আর দিন'–'আমি কি সালাত আদায় করেছি'?

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২২০-২১ পৃষ্ঠা ও ৪৮–৪৯ পৃষ্ঠা।

"এ সময়েই একদিন তিনি সমস্ত খাদেম ও মুরীদ, যারা তখন উপস্থিত ছিলেন, ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক যে, যদি ইকবাল (খাদেম) ঘরের আসবাব-দ্রব্যাদির ভেতর থেকে কোন একটি জিনিসও অতিরিক্ত সঞ্চয় করে থাকে তবে আগামীকাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে তাকে অবশ্যই এজন্য জবাবদিহী করতে হবে। খাদেম ইকবাল আরয করল যে, আমি কোন কিছুই সঞ্চয়ের জন্য মওজুদ করি নাই, ঘরেও রাখি নাই বরং সব কিছুই সাদকাহ্ করে দিয়েছি। প্রকৃতই উক্ত নওজোয়ান এরূপই করেছিল। কয়েকদিনের প্রয়োজনোপযোগী সামান্য কিছু খাদ্যশস্য খানকাহ্র ফকীর ও দীন-দরিদ্রের জন্য রেখে বাদবাকী সব কিছুই বণ্টন করে দিয়েছিল। আমার চাচা সাইয়্যেদ হুসায়ন আমাকে অবহিত করেন যে, খাদ্যশস্য ছাড়া আর সব কিছুই অভাবী ও প্রার্থীদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এ তথ্য অবগত হয়ে সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) স্বীয় খাদেম ইকবালের উপর নারায হন। তাকে ডাকা হয় এবং তিনি তাকে বলেন যে, এই নাপাক ধূলি-কণাকে কেন রেখেছ ? ইকবাল আরয করল যে, খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য আর যা কিছু ছিল সব কিছুই বণ্টিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যেখানে যে আছে সবাইকে ডাক। লোকজন উপস্থিত হলে তিনি বললেন, খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার ভেঙে দাও এবং সমস্ত খাদ্যশস্য নির্বিঘ্নে উঠিয়ে নিয়ে যাও। এর পর ঝাড়ু দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন সমবেত হয় এবং খাদ্যশস্য দেখতে না দেখতে নিঃশেষে উঠিয়ে নিয়ে যায়। রোগাক্রান্ত থাকাকালীন কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ও খিদমতগার এসে হাযির হয় এবং তারা জিজ্ঞেস করে যে, গরীবদের বর্তমান আশ্রয়স্থলের অবর্তমানে আমাদের ন্যায় হতভাগা মিসকীনদের অবস্থা কি হবে ? তিনি বললেন, এখানে এত পরিমাণ পাবে যদ্দ্বারা তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। আমি কতক বিশ্বস্ত বুযুর্গের মুখ থেকে শুনেছি যে, লোকেরা আরয জানায়, আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে হবেন ?[1] তিনি বলেছিলেন, যার ভাগ্য তাকে মদদ করবে। কতক দোস্ত ও খাদেম আমার নানা মাওলানা শামসুদ্দীন ওয়ামেগানীর নিকট আরয জানায় যেন তিনি সুলতানুল মাশায়িখকে জিজ্ঞেস করেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি আপন আপন 'আকীদা অনুযায়ী নিজ আয়ত্তাধীন এলাকার মধ্যে বড় বড় ইমারত বানিয়ে ফেলেছে এবং সবারই নিয়ত এই যে, আপনি তার ইমারতে আরাম করবেন (অর্থাৎ উক্ত ইমারত আপনার দাফনগাহ হবে)। যদি উক্ত অনিবার্য অবস্থা এসেই যায় তবে কোন ইমারতে আপনাকে দাফন করা হবে ? মাওলানা শামসুদ্দীন এই পয়গাম হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর খেদমতে

১. সম্ভবত ভাবী আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও খলীফা সম্পর্কেই এ প্রশ্ন ছিল।

পৌঁছালে তিনি বলেন, আমি মাটির খোরাকে পরিণত হতে চাই। অতঃপর এমনটিই হয়েছিল। তাঁকে ময়দানের বাইরে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ তুগলক তাঁর কবরের উপর গুম্বজ নির্মাণ করেন।

"ওফাতের ৪০ দিন পূর্ব থেকেই তিনি খাদ্য গ্রহণ একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমন কি খাদ্যের ঘ্রাণ পাওয়াকেও তিনি সহ্য করতেন না। কান্নার বেগ এত বেশী ছিল যে, ক্ষণিকের তরেও অশ্রু বিসর্জনে বিরতি ছিল না।

"এই সময়েই একদিন আখী মুবারক মাছের শুরুয়া নিয়ে হাযির। ভক্তবৃন্দ বহু চেষ্টা করল যেন তিনি এ থেকে কিছু অন্তত গ্রহণ করেন। সুলতানুল মাশায়িখ জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? বলা হ'ল যে, এটা মাছের অল্প কিছু শুরুয়া। একথা শোনার পর তিনি বললেন, প্রবাহিত পানিতে এটা নিক্ষেপ কর। এ থেকে এতটুকু পরিমাণও তিনি গ্রহণ করলেন না। আমার চাচা সাইয়্যেদ হুসায়ন আরয করলেন, আজ কয়েক দিন অতিবাহিত হতে চলল—হুযুর খানাপিনা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। শেষ অবধি এর ফলাফল কি দাঁড়াবে? তিনি বললেন, সাইয়্যেদ! যে হুযূর আকরাম (সা)-এর মোলাকাতের গভীর আগ্রহী তার পক্ষে দুনিয়ায় পুনরায় খাবার গ্রহণ আদৌ কি সম্ভব? মোটকথা, চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবেই তিনি খানাপিনা থেকে বিরত থাকেন, এক দানাও তিনি গ্রহণ করেননি। এর পর তিনি কথাও খুব কম বলেছেন। ওফাতের দিন বুধবার পর্যন্ত এরূপ অবস্থায়ই কাটে।

"১৮ই রবিউছছানী, ৭২৫ হিজরী বেলা উঠার পর যুহ্দ ও 'ইবাদত, হাকীকত ও মা'রিফত এবং হেদায়াত ও সত্যের উজ্জ্বল এই আলোকবর্তিকা অস্তমিত হয়ে যায়।

"জানাযা পড়ান শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর দৌহিত্র শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন। জানাযার পর শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন বলেন এখন আমি জানতে পারলাম যে, আমাকে চার বছর পর্যন্ত দিল্লীতে এজন্যই রাখা হয়েছিল যেন আমি এই জানাযার ইমামতি দ্বারা সৌভাগ্য হাসিল করি।"[১]

সারাটা জীবন একাকীত্বের মাঝে কেটেছিল বিধায় তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। রূহানী সিলসিলা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত এবং এখনও তা অব্যাহত আছে।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৫২-৫৪ পৃষ্ঠা;

তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্র ও গুণাবলী

সামগ্রিক গুণাবলী

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত, সামগ্রিক ও সঠিকতম পরিচিতি সেই শব্দসমষ্টির ভিতর নিহিত যা খিলাফত প্রদানের মুহূর্তে তাঁর বহুদর্শী শায়খ ও মুরশিদ (শায়খুল কবীর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি)-এর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

باری تعالی ترا علم وعقل وعشق داره است وهرکه بدین صفت موصوف باشد از
وخلافت مشائخ نیکو آید هے

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে 'ইল্‌ম, 'আকল ও 'ইশকের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। আর এ সমস্ত গুণের যিনি আঁধার হবেন তিনি মাশায়িখে কিরামের তরফ থেকে খিলাফতের অর্পিত যিম্মাদারী অতি উত্তমভাবে আদায়ে সক্ষম।

হযরত খাজা (র)-এর জীবন ও চরিত্র ছিল উপরিউক্ত গুণাবলীর সামগ্রিকতা দ্বারা সুসজ্জিত। তাঁর চরিত্রে 'ইল্‌ম, 'আকল ও 'ইশ্‌ক – এই তিনটি দিকই পরিদৃষ্ট হয়। মুহব্বত ও প্রকৃত মা'রিফত এবং শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণের তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) ও সোহবত (সহচর্য) যা উৎকৃষ্টতম প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও সুফল দান করতে পারে এবং যার উৎকৃষ্টতম সমষ্টির নাম শেষ যুগে তাসাওউফের উপর গিয়ে পড়েছে অর্থাৎ ইখলাস ও আখলাক (বিশুদ্ধচিত্ততা ও চরিত্র-ব্যবহার) -এর উৎকৃষ্টতম নমুনা তাঁর জীবনে পরিদৃষ্ট হয়।

ইখলাস

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবনে মহামূল্যবান সম্পদ যা তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের উপরই শুধু নয় বরং ইসলামের মনীষীবৃন্দের মধ্যেও

একটি সমুন্নত মর্যাদা, শুধু স্বীয় যমানারই নয় বরং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন যুগেও সাধারণ স্বীকৃতি ও চিরন্তন স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং তাঁকে জনপ্রিয়তার বিশিষ্ট পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করেছে, তা তওহীদ ও ইখলাসের সেই বিশিষ্ট অবস্থা ও স্বাদ যার মধ্যে মুহব্বত (ঐশী-প্রেম) ও রিযায়ে ইলাহী (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই আর কাম্য ও লক্ষ্য থাকে না। মুহব্বত ও ইয়াকীনের প্রেমাগ্নি সকল প্রকারের কণ্টকময় প্রতিবন্ধকতাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দুনিয়া-প্রীতি, জৌলুসপ্রীতি এবং এ ধরনের সকল প্রেমের কামনা-বাসনার মূল উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল।

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার মজলিসে আলোচনা চলছিল যে, কিছু লোক মসজিদে অবস্থান করে এবং সেখানেই কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে ও নফল আদায় করে। আমি আরয করলাম যে, যদি নিজের ঘরেই অবস্থান করে তবে তা কেমন হবে? তিনি বললেন, ঘরে এক পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মসজিদে সমগ্র কুরআন শরীফ খতম করার চাইতে উত্তম। এ প্রসঙ্গেই এ আলোচনা উত্থাপিত হয় যে, বিগতকালে এক ব্যক্তি দামিশকের জামে মসজিদে সারারাত নফল 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকত এই লোভে যে, এতে তার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে শায়খুল ইসলাম পদে (যা শূন্য ছিল) তার নিয়ুক্তিও মিলে যেতে পারে। এ কথা শোনার পর হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি বলে ওঠেন ঃ

بسوز اول شیخ الا سلامی را وپس خانقاه را و بعد ازان خود را

"এমন শায়খুল ইসলামের গদীতে আগে আগুন লাগিয়ে দাও, এরপর আগুন লাগিয়ে দাও তার খানকাহ্‌তে। এরপর খোদ শায়খুল ইসলামকেই জ্বালিয়ে দাও।"[১]

তিনি নিজের সম্পর্কেই শুধু নয়, স্বীয় খলীফা ও স্থলাভিষিক্তদের মধ্যেও (যাদের দ্বারা সততা, আখলাক এবং আত্মশুদ্ধির খেদমত নেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য) লক্ষ্য করতেন যে, তারা ইখলাসের এমনতরো মকামে পৌঁছে গিয়েছিল যে, জাঁকজমক ও জৌলুসপ্রীতি তাদের অন্তর-মানস থেকে একদম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা ফসীহুদ্দীন প্রশ্ন করেছিলেন যে, বুযুর্গদের খিলাফতের হকদার সাধারণত কারা হয়ে থাকেন। উত্তরে হযরত খাজা (র) বললেন,

کسے راکه در خاطر او توقع خلافت بناشد

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ২৪;

"তিনিই খিলাফতের হকদার বলে বিবেচিত হবার যোগ্য হয়ে থাকেন যিনি এর প্রত্যাশী নন এবং নন এর প্রতি সামান্যতম আগ্রহীও।"[১]

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন যে, একবার তাঁকে তাঁর একজন বিশিষ্ট খাদেম সম্পর্কে, যাকে এজাযত প্রদান করা হয়েছিল –অবহিত করা হয় যে, সে কয়েকটি কম্বল একত্রে ভাঁজ করে গদী বানিয়ে বিছিয়ে তার উপর বুযুর্গের ন্যায় বসে এবং আমীর-উমারা, জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার খেদমতে শ্রদ্ধাবনত ও ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে এসে থাকে। এতে তিনি এত মর্মাহত হন যে, সে পরে এলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে তাঁর এজাযতনামা থেকে বঞ্চিত করেন। দীর্ঘকাল তার প্রতি হযরত খাজা (র) এর এই বিরক্তিকর মনোভাব অব্যাহত থাকে। যতদিন পর্যন্ত না তার থেকে কোন ওযর প্রকাশ পেয়েছে এবং এ ব্যাপারে মাফ না চেয়েছে ততদিন তাঁর ক্ষমাসুলভ ও স্নেহদৃষ্টি তার প্রতি পতিত হয়নি।[২]

শত্রুর প্রতি উদারতা

আন্তরিকতা তথা বিশুদ্ধচিত্ততা, আত্মবিসর্জন এবং সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা ও নিস্পৃহ মানসিকতার মকামে পৌঁছে সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর অন্তর থেকে দুঃখ-বিষাদ, অভিযোগ, প্রতিশোধস্পৃহা এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতাই নিঃশেষ হয়ে যায়। সে শুধু আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই স্নেহপ্রবণ, সদয় ও বন্ধুবৎসল হয় না বরং দুশমনের প্রতিও কৃতজ্ঞ ও উদার মনোভাব প্রদর্শন এবং দুশমনের অনুকূলে প্রার্থনাকারীতে পরিণত হয় যেন দুশমনীও তার জন্য ইহ্সান। যে কোন আহত অন্তরের উপশমের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার অন্তর থেকে বর্ষিত হয় পুষ্পবৃষ্টি। আমীর হাসান 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত খাজা (র) নিম্নোক্ত চরণটি আবৃত্তি করেন ঃ

هر که مارا رنج داده راحتش بسیارباد

" যে আমাকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয় আল্লাহ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখুন।" এরপর তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতার লাইন দু'টি আবৃত্তি করেন ঃ

هرکه او خارے نهد درراه ما از دشمنی
هرگل کزباغ عمرش بشگفد بے خارباد

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।
২. সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

" যে আমার রাস্তায় কাঁটা বিছায়, আল্লাহ্ করুন, তার জীবনের গুলবাগিচায় যে ফুল ফুটবে তা যেন কাঁটাহীন থাকে।"

সিয়ারুল 'আরিফীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) বলতেন যে, হিসার আন্দরপতে (গিয়াছপুরের নিকটে অবস্থিত) ঝজ্জু নামের এক ব্যক্তির হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে সীমাহনি দুশমনী ছিল যার সংগত কোন কারণ ছিল না। সে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলত এবং হযরত খাজা (র)-কে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া যায় সেই ফিকিরেই থাকত। একদিন সে মারা যায়। হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) তার জানাযায় শরীক হন এবং দাফন শেষ হবার পর তার শিয়রে দু'রাকাত নফল আদায় করেন ও মুনাজাত করেন, "হে আল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি যা কিছু বলেছে, মন্দ চিন্তা করেছে আমার সম্পর্কে, আমি তা মাফ করেছি। আমার কারণে সে যেন শাস্তি না পায়।"[১]

একবার মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ভেতর কেউ আলাপ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, কোন কোন লোক জনাবেওয়ালাকে মিম্বর ও অন্যান্য স্থানে মওকা মত ভাল-মন্দ বলে থাকে, আমরা যা শুনতে পারি না। এতে হযরত খাজা (র) বললেন, আমি তাদের সবাইকে মাফ করেছি। তোমরাও তাদেরকে মাফ করে দিও এবং এ ধরনের লোকের সাথে তোমরা এজন্য ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। এরপর তিনি আরও বললেন, যদি কখনও দু'ব্যক্তির ভেতর মনোমালিন্য দেখা দেয় তবে সে মনোমালিন্য দূরীভূত করবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা হ'ল একজন তার মন থেকে তথা অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ থেকে শত্রুতার বিষবাষ্প দূর করে দেবে। এতে অপরের মন থেকেও শত্রুতার জোর ও তীব্রতা কমে যাবে।

একদিন তিনি বললেন, দুনিয়ার সাধারণ রীতি এই যে, ভালোর সাথে ভালো এবং মন্দের সাথে মন্দ ব্যবহার করা। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দাহ্দের নীতি এই যে, মন্দের মুকাবিলায়ও ভালো ব্যবহার করবে। তিনি এও বললেন ঃ

" কেউ যদি তোমার পথে কাঁটা বিছায় আর তুমিও তার পথে কাঁটা বিছাও তাহ্লে তো সারা দুনিয়াটাই কাঁটায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সর্বসাধারণের ভেতরও সাধারণ রীতি এই যে, সোজা-সরল লোকের সাথে সোজা-সরল ব্যবহার এবং বাঁকা-টেড়া লোকের সাথে বাঁকা-টেড়া ব্যবহার করা। কিন্তু দরবেশের নীতি হ'ল–সোজা-সরল লোকের সঙ্গে সোজা-সরল ব্যবহার তো বটেই, এমন কি বাঁকা-টেড়া লোকদের সঙ্গেও সৎ ও উত্তম ব্যবহার করা।"[২]

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন।

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৮৭;

এক্ষেত্রে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর মাপকাঠি এত উঁচু ও সমুন্নত ছিল যে, মন্দ বলা তো বহু দূরের কথা, মন্দ কামনা করাটাও ছিল তাঁর রুচি ও প্রকৃতির বাইরে। একবার তিনি বলেছিলেন, মন্দ বলাটা নিঃসন্দেহে খারাপ, কিন্তু মন্দ কামনা অধিকতর খারাপ।[১] যখন এ ধরনের ব্যবহার তাঁর সবার সাথে তখন স্বীয় শায়খ, নিয়ামতপ্রাপ্ত ওলী-আওলিয়া, বন্ধু-বান্ধব এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম হবেই বা না কেন, যাদের ইহসান দ্বারা তিনি পরিপূর্ণরূপে আপ্লুত হয়েছিলেন।

'সিয়ারুল আরিফীন' নামক গ্রন্থে আছে যে, হযরত শায়খ নজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের দৌহিত্র খাজা 'আতাউল্লাহ ছিল একজন বেপরোয়া ও নির্ভীক যুবক। একদিন সে শায়খের দরবারে কাগজ, কালি ও কলম নিয়ে হাযির হল। বলল, আমার জন্য অমুক সর্দারকে একটি সুপারিশপত্র লিখে দিন যাতে সে আমাকে উল্লেখযোগ্য একটা অংকের টাকা দিয়ে দেয়। শায়খ (র) বললেন, উক্ত সর্দারের সাথে যেমন আমার কখনো মোলাকাত হয়নি, তেমনি সেও কখনো আমার এখানে আসেনি। যার সঙ্গে আমার আদৌ পরিচয়ই হয়নি, তাকে আমি এ ধরনের চিরকুট কি করে লিখতে পারি? এতে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, আপনি আমারই নানার মুরীদ আর আমাদেরই খান্দানের দানে লালিত। আর কিনা আজই এতদূর অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছেন যে, আপনার দ্বারা আমার জন্য এতটুকু চিরকুট লেখাও চলে না? এ আপনি কি ধরনের পীর-মুরীদীর জাল বিছিয়ে রেখেছেন এবং আল্লাহ্‌র মাখলুককে ধোকা দিচ্ছেন? এই বলে সে দোয়াত সজোরে যমীনে নিক্ষেপ করে উঠে চলে যেতে উদ্যত হয়। অমনি হযরত খাজা (র) তার জামার প্রান্তদেশ টেনে ধরেন এবং বলেন, অসন্তুষ্ট হয়ে কোথায় যাচ্ছ? খুশী হয়ে যাও। এরপর একটা পরিমাণ মত টাকা দিয়ে তাকে খুশী করে বিদায় দেন।[২]

দোষ গোপন এবং মহত্ত্ব ও ঔদার্য

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে আছে যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর দরবারে আগমনকারীদের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, বাইরে থেকে যখনই কেউ আসত, শিরনী (মিষ্টান্ন দ্রব্য) অথবা কোন তোহফা খরিদ করে সাথে নিয়ে আসত এবং দরবারে পেশ করত। একবার কতকগুলো লোক এইরূপ নিয়তেই আসছিল। জনৈক মৌলভী সাহেবও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি ভাবলেন, সব

---

১. সিয়ারুল ওলিয়া, পৃষ্ঠা ৫৫৪;
২. সিয়ারুল 'আরিফীন।

লোকই তো বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা পেশ করবে এবং তারা সেগুলি হযরত খাজা (র)-এর সামনে একত্রে রাখবে। এরপর খাদেম সেগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি কি করে জানবেন কে কি এনেছে! অতঃপর তিনি কিছু মাটি রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কাগজে বেঁধে সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর দরবারে হাযির হন। প্রত্যেকেই যে যার জিনিস সামনে রেখে দেয়। মৌলভী সাহেবও নিজের পুটলিটা যথানিয়মে সামনে রেখে দেন। খাদেম সব কিছু উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয় এবং পুটলিটাও উঠাতে যায়। এতে হযরত খাজা (র) বললেন, "এটাকে এখানেই রেখে যাও। এটা হবে আমার চোখের সুরমা।" হযরত খাজা (র)-এর আমল আখলাক এবং উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে উক্ত 'আলিম সাহেব তওবা করেন এবং তাঁর মুরীদ হন।[১]

স্নেহপ্রবণতা ও আত্মীয়-কুটুম্বিতা

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাজা (র) কে সাধারণ মানবমণ্ডলী এবং ব্যক্তি বিশেষের সাথে সাথে মুসলমান ও আত্মীয়-কুটুম্বদের প্রতি এমনই স্নেহপ্রবণতা ও মুহব্বত দান করেছিলেন যে, যদি তাকে মায়ের স্নেহপ্রবণতার সঙ্গে তুলনা করা হয় কিংবা তা থেকেও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয় তবে বাস্তব ঘটনাবলীদৃষ্টে তা আদৌ অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে না। মহান ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গদের এই স্নেহপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে নবীয়ে আকরাম (র)-এর সেই স্নেহ-প্রবণতারই উত্তরাধিকারিত্ব যার হাকীকত কুরআনুল করীমের সূরা তওবাহ্তে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে উহা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদিগের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (সূরা তওবাহ্, ১১৮ আয়াত) অধিকন্তু এটা সেই হুকুমেরই তামীল যে সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (স) কে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ

"এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।" (সূরা শু'আরা, ২১৫ আয়াত)

এই আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা ও স্নেহপ্রবণতা এমনই এক সুদৃঢ় 'ইত্তিহাদ' (ঐক্য) পয়দা করে দিয়েছিল যে, অপরের শারীরিক কষ্টে নিজের কষ্ট এবং অপরের আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে নিজের মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি মিলত। আমীর হাসান 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার বৈঠক অনুষ্ঠিত

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৪২ পৃ.।

হচ্ছিল। ছায়ায় স্থান সংকুলান না হওয়াতে কেউ কেউ রৌদ্রে বসেছিল। ছায়ায় উপবেশন কারীদের লক্ষ্য করে হযরত খাজা (র) বললেন, ভাইয়েরা তোমরা একটু মিলেমিশে বস যাতে তোমাদের ভাইদেরও স্থান সংকুলান হয় এবং তারাও বসতে পারে। এরা রৌদ্রে বসে আছে আর আমি তাদের অগ্নিদগ্ধ করছি।[১]

একবার তিনি জনৈক বুযুর্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেন যা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজ অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব আর তা ছিল এই যে, "আল্লাহ্র মাখলুক আমারই সামনে আহার করে থাকে, আর তাদের খানা আমি আমার কণ্ঠনালীতে অনুভব করি অর্থাৎ তারা নয়, সে খানা যেন আমিই খাচ্ছি।"[২]

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বলেন যে, আমি একবার অসময়ে গিয়ে হাযির হই এবং আরয করি যে, আমি এ দিকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। একবার হাযিরা দিতে মন চাইল। কোন কোন দোস্ত বলল যে, যদি কেউ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও কাজে এসে থাকে এবং প্রথম থেকে এখানে আসার আদৌ ইচ্ছা না থাকে তবে হযরত শায়খ (র)-এর খেদমতে উপস্থিত না হওয়াটাই সমীচীন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, যদিও নিয়মটা এই, কিন্তু অন্তর তো প্রবোধ মানে না যে, আমি এখানে এসেও হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে একবার সাক্ষাত না করেই ফিরে যাই। আজ আমি সেই নিয়মের খেলাফই করব। যখন দেখা করলাম তখন উত্তর ছিল, এসে ভালই করেছ। এরপর আরও বললেন, বুযুর্গদের নিয়ম এটাই যে, কেউ তাদের নিকট ইশরাকের আগে এবং 'আসরের পরে যায় না। কিন্তু আমার এসব কোন নিয়ম নেই। যখনই মন চাইবে চলে আসবে।[৩]

সাধারণের প্রতি সমবেদনা

এইসব আল্লাহওয়ালা লোকেরা এমনিতে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং অন্তর থেকেই এর প্রতি বিমুক্ত, কিন্তু দুনিয়াবাসীর দুঃখ-শোক ও আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের চিন্তায় তাঁরা থাকেন বিমর্ষচিত্ত। তাঁরা একদিকে নিজেদের শোক-দুঃখ ভুলে থাকেন, অপরদিকে সারা দুনিয়ার শোক-ব্যথাকে নিজেদের শোক-ব্যথায় পরিণত করেন। একথা বলবার অধিকার প্রকৃতপক্ষে তাঁরই যাঁরা বলেন,

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں "সমগ্র দুনিয়ার ব্যথা-বেদনা আমাদের অন্তরে লালিত ও পোষিত।"

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৯১পৃ.।

২ সিয়ারুল আওলিয়া, ৭৭পৃ.;

৩ ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৯৮পৃ.।

খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর দৌহিত্র খাজা শরফুদ্দীনকে কোন এক মজলিসে জনৈক সূফী বলেছিলেন যে, খাজা নিজামুদ্দীন (র) আশ্চর্য উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। একাকী থাকেন; পরিবার-পরিজন কিংবা বাচ্চা-কাচ্চার কোন ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। এসব থেকে তিনি এমনই মুক্ত যে, এক বিন্দু চিন্তা-ভাবনাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। হযরত খাজা (র)-এর ভক্ত শরফুদ্দীন উক্ত মজলিস থেকে উঠে হযরত খাজা (র)-এর খেদমতে হাযির হন। ইচ্ছা করেছিলেন যে নিজেই তা বলবেন। এদিকে হযরত খাজা (র) নিজেই বলেন,

"মিঞা শরফুদ্দীন! সময়ে আমার অন্তরে যে দুঃখ-বেদনার সঞ্চার হয়ে থাকে সম্ভবত অপর কোন ব্যক্তির এর থেকে বেশী হয় না। কোন লোক যখন আমার নিকট আসে, নিজের হাল-অবস্থা আমাকে ব্যক্ত করে তখন তার দ্বিগুণ ব্যথা-বেদনা ও চিন্তা-ভাবনা আমার অন্তরে সঞ্চারিত হয়। অত্যন্ত কঠোরমনা ও নির্মম হৃদয় সে যার দীনী ভাইয়ের শোক-ব্যথা তার অন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও আরও বলা হয়েছে ঃ

المخلصون على خطر عظيم। "আল্লাহ্‌র মুখলিস বান্দারা সর্বদাই বড় বিপদের মুকাবিলা করে থাকে।"

হযরত খাজা (র)-এর মতে, মুসলমানদের অন্তরকে খুশী করা,[১] তাদের অন্তর প্রশান্তি ও আনন্দে ভরে দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট আমল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ

"আমাকে স্বপ্নে একটি কিতাব দেওয়া হয়। তাতে লেখা ছিল: যতটুকু সম্ভব মানুষের অন্তর খুশী রাখতে এবং আনন্দ ও তৃপ্তিতে তা ভরে রাখতে। কেননা মু'মিনের অন্তর রবুবিয়তের গোপনতম রহস্যের ভাণ্ডার। জনৈক বুযুর্গ কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

می کوشش که راحت بجانے برسد
یادست شکسته بنانے برسد

" চেষ্টা কর যেন মানুষের অন্তর তোমার দ্বারা আরাম পায় অথবা যে গরীব দীন-ভিখারী সে যেন তোমার দ্বারা রুটি-রুযীর বন্দোবস্ত করতে পারে।"

একবার বলেছিলেন ঃ

"কিয়ামতের দিন কোন পণ্যসামগ্রীর এত বেশী দাম হবে না যেরূপ দাম অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখার এবং অপরের অন্তর-মনকে আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে দেওয়ার"।[২]

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা।

ছোটদের প্রতি স্নেহ

হযরত খাজা (র) স্বীয় মূল্যবান মুহূর্তের হাযারো রকমের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এবং অধ্যাত্ম্য জগতের উন্নত মার্গে বিচরণ করা সত্ত্বেও কচি মা'সূম বাচ্চা ও ছোটদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং নিজের ভীষণ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের অন্তর হাসি-খুশী ও মায়া-মমতায় ভরে দিতে আলাদা সময় করে নিতেন। এই বিরাট দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিক নিমগ্নতা সত্ত্বেও তিনি বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখতেন এবং এমনকি তাদের ছোটখাটো কথাবার্তার দিকেও খেয়াল রাখতেন।

খাজা রফী'উদ্দীন ছিল তাঁর আপন ভাতিজার পুত্র। যদি কখনও খাবার সময় হ'ত এবং সে তখন হাযির না থাকত তবে বড় বড় বুযুর্গ দস্তরখানের উপর উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি তার আগমনের অপেক্ষা করতেন। তিনি আপন ছেলের মতই একাকীত্বে ও মজলিসের জনসমাগমে তাকে তরবিয়ত দিতেন ও তার মন রক্ষা করে চলতেন।[১]

খাজা রফী'উদ্দীন তীর-ধনুক এবং সাঁতার খেলা ও কুস্তি লড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিল। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ অত্যন্ত আদর সোহাগের সাথে তার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন, তাকে উৎসাহ দিতেন ও উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। এসব বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকও খুটিনাটি বিষয়ে তাকে তা'লীম দিতেন যাতে সে খুশী হয়।[২]

যে সমস্ত অভিজাত বংশীয় যুবক এবং অর্থকড়ির দিক দিয়ে সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি স্বীয় যুগের সৌখিন লোকদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত হযরত খাজা (র) এদেরও খাতির করতেন এবং এটাকে তাদের যৌবন ও তারুণ্যের স্বাভাবিক দাবি মনে করে উপেক্ষা করতেন। অধিকন্তু স্বীয় চরিত্র-মাধুর্য, সদ্ব্যবহার ও স্নেহ-ভালবাসার দ্বারা তাদেরকে ইসলাহ (সংস্কার-সংশোধন) ও তরবিয়তের অধীনে আনয়ন করতে প্রয়াসী হতেন।

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা আমীর খোরদ লিখেন যে, আমার চাচা সাইয়্যেদ হুসায়ন কিরমানী ছিলেন তখন যুবক। সে যুগের স্বাভাবিক প্রবণতা মাফিক যৌবনসুলভ চপল পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে একদিন তিনি হযরত খাজা (র)-এর দরবারে এসে হাযির। হযরত (র) তাকে দেখে বলেন,

سید بیاد بنشیں وسعادت بیر

(সাইয়্যেদ এসে বস এবং সৌভাগ্যের অংশীদার হও)।[৩] আল্লাহ্ই ভাল

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা,
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা,
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা,

জানেন যে, এই আদর-সোহাগ, স্নেহ-মমতা ও খাতির-যত্নের ফলে কত যুবকেরই না ইসলাহ ও তরবিয়ত লাভ সম্ভব হয়েছে, আর কত কঠিন বন্য স্বভাবের লোকই না প্রেম-মুহব্বতের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং আল্লাহ্র মকবুল বান্দাহ ও কামিল বুযুর্গগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

হযরত খাজা (র)-এর এই সব আখলাক ও গুণাবলী এবং সূফীয়ায়ে কিরামের ন্যায় জীবনচরিত দেখে ইমাম গাযালী (র)-এর সেই অভিমত ও সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় যা তিনি 'সত্যের সন্ধানে" দীর্ঘ সফর এবং বিভিন্ন গ্রূপ ও মানুষের নানা শ্রেণী সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের পর প্রকাশ করেছিলেন, "আমি নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছি যে, সূফী সম্প্রদায়ই একমাত্র আল্লাহ্র পথের পথিক, তাঁদের জীবনচরিতই সর্বোত্তম জীবনচরিত, তাঁদের পথই অত্যধিক মযবুত ও সুদৃঢ় এবং তাঁদের আখলাকই (চরিত্র-ব্যবহার) সর্বাপেক্ষা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সঠিক ও বিশুদ্ধ। যদি বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং শরীয়তের সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিদগণের সূক্ষ্ম জ্ঞান একত্রে মিলেও তাঁদের জীবনচরিত ও আখলাক থেকে উত্তম কোন কিছু আনয়ন করতে চায়, তবে তা সম্ভব হবে না। তাঁদের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সকল প্রকার গতিবিধি নবুওতের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকমালা দ্বারা নির্দেশিত ও আলোকপ্রাপ্ত। আর নূরে নবুওত থেকে উজ্জ্বলতর কোন নূর দুনিয়ার বুকে কিই-বা হতে পারে যা থেকে আলো গ্রহণ করা যেতে পারে?"[১]

---

৩. আল-মুনকিয মিনাদ্দালাল ('দিশারী' ও 'সত্যের সন্ধান' নামে বাংলায় অনুদিত)।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাদ-আহলাদ ও বাস্তব অবস্থাদি

প্রেম-মুহব্বত ও স্বাদ-আহলাদ

হযরত খাজা (র)-এর জীবন-চরিত ও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, যা তাঁর গোটা আমল-আখলাক ও সামগ্রিক অবস্থাকে ঘিরে আবর্তিত, তা ছিল ঐশীপ্রেম যা আল্লাহ্-প্রদত্ত নিয়ামত এবং যা তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবে আশৈশব একদম মিশে গিয়েছিল, শায়খুল কবীরের সাহচর্য এবং চিশতীয়া তরীকার সম্পর্কের কারণে যিনি উত্তপ্ত লৌহশলাকায় পরিণত হয়েছিলেন তাঁর সারাটা জীবন এবং অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল দিল্লী ও তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে উত্তপ্ত ও আলোকিত করে রেখেছিল এবং ঐ একই কারণে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ ঐশীপ্রেমের (ইশ্কে ইলাহীর) উত্তাপ দ্বারা উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত ছিল। তাঁর সমগ্র অবস্থা, কর্মব্যস্ততা, আলাপ-আলোচনা ও বৈঠকাদি, কাব্যচয়ন ও নির্বাচন, সংঘটিত ঘটনাবলী ও তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত—মোটকথা প্রত্যেকটি জিনিস থেকেই সেই আধ্যাত্মিকতার রশ্মি ও সেই উত্তপ্ত 'ইশকের প্রকাশ ঘটত

ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন আল্লাহ্র ওলীদের জীবনের ঘটনাবলীর উপর আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জনৈক বুযুর্গের কাহিনী বর্ণনা করল যে, তাঁর ইন্তিকাল হচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে আল্লাহ্র নাম তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল। একথা শোনার পর হযরত খাজা (র)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদী আবৃত্তি করেন ঃ

ایم بسر کوئے تو پویاں پویاں

رخسارہ باہدیدہ شویاں خویاں

بیچارہ زوصل جویاں جویاں

جاں می دهم ونام تو گویاں گویاں

" তোমার গলিতে চলে আসছি উত্তম ও স্বচ্ছন্দ গতিতে আর গণ্ডদ্বয় চোখের পানিতে ধুয়ে চলছি। তোমার মিলনের প্রত্যাশায় জীবন দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার নাম জপে চলেছি।"

এ প্রেমের পরিণতি এই ছিল যে, অন্তরে স্বীয় প্রেমাস্পদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া অন্য কোন কিছুর স্থান ছিল না এবং অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করার মত অবকাশও ছিল না।

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি বলেন, যদি কখনো আকস্মিকভাবে ঐ সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন করতে শুরু করি যা আমি পড়েছি তখন আমার প্রকৃতিতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নিজের মনেই বলি, এ আমি কোথায় এসে পড়েছি। এক্ষেত্রে হযরত খাজা (র) আবু সা'ঈদ আবুল খায়ের (র) -এর ঘটনা বিবৃত করেন। খাজা আবু সা'ঈদ কামালিয়াতের দর্জায় পৌছবার পর যে সকল কিতাব তিনি এককালে পাঠ করেছিলেন এবং যা ঘরের এক কোণে শোভা পাচ্ছিল, একদিন অধ্যয়ন করা শুরু করেন। অমনি গায়েবী আওয়াজ ভেসে আসে, হে আবু সা'ঈদ! আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ফিরিয়ে দাও। এখন তো তুমি অন্য জিনিসে মশগুল হয়ে গেছ। হযরত খাজা (র) এই পর্যন্ত পৌছেই কেঁদে ফেলেন। প্রেমের এই বাদশাহ্র পরিণতি তো এই ছিল যে, রাতের নির্জন ও গোপন একাকীত্বে অতিবাহিত করবার পর দিনের আলোয় যখন তিনি উপস্থিত হতেন তখন মনে হ'ত– আমীর খোরদের ভাষায় –মত্ততা উপচে পড়ছে। রাত বিনিদ্র কাটাবার কারণে চোখ সাধারণত রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং প্রেমের এই উত্তাপ ও মত্ততার এই আমেজের পরিণতি এই ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সে বরাবরই তিনি সিয়াম পালন করে চলতেন। অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ, বিনিদ্র রাত্রি যাপন এবং কঠিন মুজাহাদা সত্ত্বেও দুর্বলতা কিংবা শক্তিহীনতার কোন আলামত তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত না। আশি বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চেহারায় সেই লালচে আভা এবং তারুণ্য ও খুশীর সেই ঝলকেরই সাক্ষাত মিলত, যা সাধারণত যৌবনেই মেলে বরং তা যেন দিন দিন বেড়ে চলছিল। [১]

সামা'[২]

প্রেমের এই উত্তাপ, জ্বালা ও অস্থিরতার উপশমের একটি মাত্র মাধ্যম ছিল, আর তা হল 'সামা' অর্থাৎ 'ইশ্‌কে ইলাহীতে ভরপুর কাব্য এবং আধ্যাত্মিক

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া।

২. সামা'র মসলা (বিনা বাদ্যযন্ত্রে)-এর পক্ষে-বিপক্ষে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্যময় ও যুক্তিপূর্ণ বিধান এই যে, সামা' আদতে হারাম যেমন নয়,

বাকি অংশ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

ভাবপূর্ণ শ্লোকমালা শোনা যদ্দ্বারা অন্তর তার তাপ উদ্‌গীরণের সুযোগ পায় এবং অশ্রুর ঝাপ্টা দ্বারা তার উষ্ণতা হ্রাস করার মওকা মেলে। এই সঙ্গে মুজাহাদার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ ও প্রকৃতি এবং আহত দেমাগ নফী' যিক্‌রের কারণে যেন সজীবতা ফিরে পায়। মাওলানা রুমীও সামা'র একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্বয়ং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) নিজ মুখেও 'সামা' সম্পর্কে তথা এর বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলেছেন।

'সামা' সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুরীদ, ভক্তি-শ্রদ্ধার অধিকারী আধ্যাত্মিক পথের কঠোর সাধকের জন্যই সাজে– যখন প্রকৃতি ও দেহ আহত ও বিবশ হয়ে পড়ে (যে সামা' থেকে শক্তি ও সজীবতা লাভ করবে)। হাদীস পাকে বলা হয়েছে ঃ

ان لنفسك عليك حقا তোমাদের উপর তোমাদের শরীরেরও হক রয়েছে। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত নফস সামা'র মাধ্যমে আরাম ও শান্তি লাভ করার পর পুনরায় কাজের উপযোগী হয়।[১]

মাওলানা কাশানী নামক জনৈক বুযুর্গ বলেন, "রিয়াযত ও মুজাহাদা-কারীদের অন্তঃকরণ ও নফস আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থার আধিক্যবশত কখনো কখনো বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরে যায় এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এর উপর সেই ফয়েয ও প্রশস্ততা যা সকল আমল ও হালতের ক্ষেত্রে ঢিলেমী ও অলসতার কারণে ঘটে– প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য শেষ যুগে বুযুর্গগণ মিষ্টি ও সুমধুর আওয়াজে রুচিশীল ও শোভন গান এবং উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কবিতা শ্রবণকে রূহানী চিকিৎসা হিসেবে অনুমোদন করেন– অবশ্য তা যদি শরীয়তের গণ্ডী অতিক্রম না করে।"[২]

অতঃপর 'সামা' হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এবং তাঁর বুযুর্গদের (যাঁরা এমত অবস্থার অধিকারী এবং প্রেমের আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন)

(পূর্ব পৃষ্ঠা পর) তেমনি তা কোন 'ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য-অনুসরণও নয়– নয় কোন পরম লক্ষ্য, বরং এ একটি ভারসাম্যময় ও নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তাধীনে একটি তদবীর ও চিকিৎসা এবং প্রয়োজনের

মুখাপেক্ষী ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তির জন্য জরুরত মাফিক কখনও মুবাহ্, আবার কখনও কল্যাণকর। এ ক্ষেত্রে চিশতীয়া তরীকার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরীর উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও ভারসাম্যময় বলে মনে হয়। এক বৈঠকে সামা' হালাল কি হারাম এ সম্পর্কে বাহাছ হচ্ছিল। কাযী সাহেব বললেন, "আমি হামীদুদ্দীন সামা' শুনি এবং একে মুবাহ মনে করি। এর পেছনে ভিত্তি হল– 'উলামায়ে কিরামের বর্ণিত রেওয়ায়েত এবং তা এজন্যও যে, আমি অন্তরের ব্যথার রোগী আর সামা হ'ল এর দাওয়াই। ইমাম আবু হানীফা (র) মদ দ্বারা চিকিৎসা করানো সেই ক্ষেত্রে জায়েয বলেন যখন রোগ নিরাময়ের আর কোন দাওয়াই মেলে না। এরই উপর কিয়াস যে, আমার মনের দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা সঙ্গীতলহরী শ্রবণ। অতএব আমার জন্য তা শোনা হালাল হলেও তোমাদের জন্য তা হারাম।" সিয়ারুল আকতাব কলমী;

১. সিয়ারুল আওলিয়া;

২. মিসবাহুল হিদায়াত, ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠা;

নিমিত্ত আরাম ও শান্তির উপকরণ, শক্তির খোরাক এবং আপন প্রেমাষ্পদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার মাধ্যম ছিল–যাকে ঐ সমস্ত বুযুর্গ মানসিক চিকিৎসার্থে ও প্রয়োজনীয়তার তাকীদে অবলম্বন করতেন আর তাও অবলম্বন করতেন চিকিৎসা ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক দাবি মাফিক। এটা তাদের না 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল আর না ছিল আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এটা আধ্যাত্মিক সাধন পথে স্থায়ী কোন পদ্ধতি কিংবা রাত্র-দিনের একমাত্র ধ্যান-ধারণাও ছিল না।

এরই সাথে সাথে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) শরীয়ত-বিরোধী গর্হিত বেদাত এবং ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়াদি যা অমুসলিমদের প্রভাব থেকে বিশেষ করে ভারতবর্ষে প্রবৃত্তি ও খেয়ালী পূজকরা অথবা বিভ্রান্ত সূফীরা সামা'র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, নিজেকেও যেমন দূরে রাখেন, তেমনি স্বীয় অনুসারীদেরও এসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকার কড়া তাকীদ দেন। সামা'র আদব সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"সামা' চার প্রকার ঃ যথা হালাল, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ্। সামা'র ভাবসাগরে উন্মত্ত ব্যক্তি যদি 'মাহবুবে হাকীকী' তথা প্রকৃত প্রেমাষ্পদের অত্যধিক লক্ষাভিসারী হয় তবে 'সামা' মুবাহ্, আর 'মাহবুবে মাজাযী' তথা অপ্রকৃত প্রেমাষ্পদের দিকে হলে তা হবে মাকরূহ। 'মাহবুবে মাজাযী'র পূর্ণ লক্ষ্যাভিসারী হলে তা হবে হারাম আর 'মাহবুবে হাকীকী'র দিকে পূর্ণ লক্ষ্যাভিসারী হলে তা হবে হালাল। সামা'র ব্যাপারে যিনি আগ্রহী হবেন তিনি যেন এই চারটি বিষয়ে জেনেই এ পথে অগ্রসর হন।"

অধিকন্তু তিনি আরও বলেন, "সামা' মুবাহ হবার জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। 'সামা' যিনি শোনাবেন তাঁর জন্য শর্ত এই যে, তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হবেন; অল্পবয়স্ক কিংবা কোন নারী যেন না হয়। শ্রোতা যা কিছু শুনবেন তা যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে মুক্ত না হয়। আর যা কিছু শোনানো হবে তা যেন নির্লজ্জতা ও হাসি-ঠাট্টামূলক কিছু না হয়, আর সামা'র মাধ্যম তবলা, ঢোল, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র যেন না হয়।"[১]

বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞা

হযরত খাজা (র) বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং এব্যাপারে কারো থেকে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ পেতে দেখলে অত্যন্ত নারায হতেন, আর এক্ষেত্রে কোনরূপ ওযর-আপত্তি তিনি গ্রহণ করতেন না। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া ৪৯১–৪৯২ পৃষ্ঠা;

"মজলিসে একবার এক ব্যক্তি হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর খেদমতে আরয করল, বর্তমানে বেঁচে আছেন এমন কতিপয় দরবেশ এমন একটি মজলিসে–যেখানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল–অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে তারা নাচেও অংশ নিয়েছেন। সুলতানুল মাশায়িখ (র) একথা শুনে বললেন, তাঁরা মোটেই ভাল কাজ করেনি। যে কাজ শরীয়ত-বিরোধী তা আদৌ পছন্দনীয় নয়। এতে আরও এক ব্যক্তি আরয করল, এই সমস্ত দরবেশ যখন উল্লিখিত মজলিস থেকে বের হয় তখন লোকেরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনারা এ কী করলেন? এ মজলিসে তো বাদ্যযন্ত্র ছিল, আপনারা সামা' কিভাবে শুনলেন এবং নাচেই-বা অংশ নিলেন কিভাবে? তারা জবাবে বলল, আমরা সামা'র মধ্যে এমনভাবে মগ্ন ও সমাহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের খেয়াল করার আদৌ কোন অবকাশই ছিল না যে, এখানে কোন বাদ্যযন্ত্র আছে। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ একথা শুনে বললেন, এটা কোন জবাব হ'ল না। এটা তো প্রতিটি নাফরমানী ও অন্যায় কাজের ক্ষেত্রেই বলা চলে।"[১]

হযরত খাজা (র) বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করতেন। তিনি বলতেন ঃ

"যেখানে একজন মহিলার জন্য ইমামের ভুল শোধরাবার নিমিত্ত সালাতের মধ্যে হাতের শব্দ কিংবা তালি বাজিয়ে ইমামকে সতর্ক করবার অনুমতিটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এবং এটাকে অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যেখানে অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুক থেকে পরহেয থাকার ব্যাপারে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে[২] সেখানে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা স্বভাবতই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।"

সামা'র মধ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর অবস্থা

হযরত খাজা (র) বলতেন, আল্লাহ পাক যাকে ব্যথা-বেদনা ও স্বাদ-উপলব্ধি দান করেছেন তিনি বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকেই ও একটি মাত্র কলি শ্রবণেই অশ্রু-আপ্লুত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যার স্বাদ ও উপলব্ধির ব্যাপারে আদৌ কোন মাত্রাজ্ঞান নেই তার সম্মুখে পাঠ-আবৃত্তি যতই চলুক না কেন, আর যত বাদ্যযন্ত্রই তার সামনে উপস্থাপিত হোক না কেন, তার উপর কোনটিরই আছর হবে না। কেননা সে তো বেদনার্তদের কেউ নয়। এর সম্পর্ক তো বেদনা-বিধূরতার সঙ্গে–বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নয়।[৩]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫২০-৫২১ পৃষ্ঠা;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৫২২;

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৫২৩;

বস্তুত হযরত খাজা (র)-এর অবস্থা তো এই ছিল যে, 'ইশ্‌ক-ইলাহী ও আধ্যাত্মিক ভাবধারামণ্ডিত কবিতা শুনতেই তিনি অশ্রু-আপ্লুত হয়ে উঠতেন, অথচ লোকে তা জানতে পারত না। খাদেম শুকনো রুমাল দিত আর সে রুমাল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। এরপরই শুধু লোকেরা জানতে পারত হযরত খাজা (র) অশ্রু-ভারাক্রান্ত।[১]

আমীর খোরদ (যিনি নিজেও শৈশবে ও বাল্যে এ ধরনের সামা'র মজলিসে শরীক হতেন এবং অধিকাংশ সময়ই আপন পিতা ও চাচার সঙ্গে এইসব ভাব-গম্ভীর মজলিস ও মত্ততা সৃষ্টিকারী উত্তেজক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন যা সেখানে পড়া হত) বলেন যে, কখনো অনেকগুলো কবিতা আবৃত্তি করা হ'ত, কিন্তু কোনরূপ আবেশ-বিহ্বলতা সৃষ্টি হ'ত না। আকস্মিকভাবে কেউ হিন্দী দোহা কিংবা ফারসী প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করে বসত আর মজলিসে ভাবের জোয়ার সৃষ্টি হ'ত।

কথিত আছে যে, একবার কয়েরবাক নামক বাদশাহ্‌র একজন আমীর একটি মহফিলের আয়োজন করেন। শহরের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বুযুর্গ এতে হাযির হন। 'সামা' শুরু হল। কথক অনেক কিছুই শোনাল,কিন্তু তাতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'ল না। শেষ অবধি হাসান বাহদী কাওয়াল নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেনঃ

:رکلبه درویشی در محنت بیخویشی
مگذار مرا بامن هر سوئے مکن افسانه

কবিতা আবৃত্তি করতেই হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর উপর কান্না ও আবেগাপ্লুত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এ অবস্থার প্রতিক্রিয়া মজলিসে উপস্থিত সবাইকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে দেয়।[২]

অন্য আর একটি মজলিসের ঘটনা শুনুন।

বালাখানাতে মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমীর খসরু দাঁড়িয়ে এবং সুলতানুল মাশায়িখ অসুস্থতার কারণে চারপায়ীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। হাসান বাহদী শায়খ সা'দী (র)-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

سعدی تو کیستی که درائی دریں کمند
چنداں فتاده اندکه ماصید لا غریم

---

১. ঐ, ৫৪ পৃষ্ঠা;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫১৪ পৃষ্ঠা;

হযরত খাজা (র)-এর অশ্রুরুদ্ধ অবস্থা তখন এবং এতে তিনি গভীরভাবে সমাহিত হয়ে যান। খাজা ইকবাল রুমাল এগিয়ে দিয়ে চলেছিলেন আর তিনি বারবার চোখ মুছে হাসান বাহদীর দিকে তা ঠেলে দিচ্ছিলেন। কিছু বিলম্বে 'সামা' সমাপ্ত হল। আমীর খসরুর পুত্র আমীর হাজী তার পিতারই গযল আবৃত্তি করতে শুরু করে যার একটি পংক্তি ছিল এই ঃ

خسرو تو کیستی که در آنی دریں شماد

کیں عشق تیغ بر سرمرد ان دیں زده است

অমনি হযরত খাজা (র)-এর উপর পূর্বোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল এবং তিনি অনেক বেশী কাঁদলেন।[১]

একবার আমীর খসরু গযল পড়েন যার প্রথম স্তবক ছিল এই ঃ

رخ جمله رانمود مراگفت تو مبیں

زیں ذوق مست بیخبرم کیں سخن چه بود

তিনি আড় চোখে আমীর খসরুকে একবার দেখলেন। ব্যস! পূর্বোক্ত অবস্থায় তিনি ফিরে গেলেন।[২]

সাধারণত যে কবিতাতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর স্বাদ অনুভূত হ'ত ও তিনি আবেগাপ্লুত হতেন, দিল্লীর মজলিস-মহফিলে এবং শহরের অলিতে- গলিতে বেশ কিছুকাল যাবত তার চর্চা অব্যাহত থাকত। লোকেরা এথেকে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করত।[৩] সুলতান 'আলাউদ্দীনও তাঁর দরবারের সভাসদ এবং হযরত খাজা (র)-এর দরবারে যাতায়াতকারীদের বিশেষভাবে তাকীদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যে কবিতায় হযরত খাজা (র)-এর স্বাদ ও মত্ততা আসবে তা যেন মনে রাখা হয় এবং বাদশাহকে শোনানো হয়। অধিকাংশ সময় এমন হ'ত যে, বাদশাহ যখন এ রকম কবিতা শুনতেন যে কবিতায় হযরত খাজা (র)-এর মত্ততা ও আবেগ এসেছিল—অত্যন্ত প্রশংসা করতেন এবং বহুক্ষণ ধরে স্বাদ গ্রহণ করতেন।

কুরআনুল করীমের স্বাদ

কুরআনুল করীমের স্বাদ গ্রহণ, তা হেফজ করার ব্যবস্থাকরণ ও তেলাওয়াতের আধিক্য চিশতীয়া তরীকার তথা চিশতীয়া সিলসিলার মাশায়িখে

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫১৫ পৃষ্ঠা;
২. ঐ, ৫১৬ পৃষ্ঠা;
৩. ঐ, ৫১০ পৃষ্ঠা;

কিরামের চিরন্তন নীতি। হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)- থেকে নিয়ে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) পর্যন্ত সবাই কুরআন মজীদ থেকে বিশেষভাবে স্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ খাস খলীফা ও বিশিষ্ট মুরীদদিগকে কুরআনুল করীম হেফজ করতে এবং এরই মাঝে মগ্ন ও আত্ম-সমাহিত দেখতে চেয়েছেন, আর এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদও করে গেছেন।[১]

খেলাফত প্রদানের মুহূর্তে শায়খুল কবীর (র) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র)-কে কুরআনুল করীম হেফজ করতে ওসিয়ত করেছিলেন। হযরত খাজা (র) সে ওসিয়ত পূরণ করেছিলেন এবং দিল্লী পৌঁছুতেই এ সিলসিলাও শুরু করে দেন। হযরত খাজা (র) নিজ মুরীদ ও বিশিষ্ট সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকেন–দিতে থাকেন বিশেষ তাকীদ। আমীর হাসান 'আলা সিজযী যখন হযরত খাজা (র)-এর ভক্তে পরিণত হন তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কবিতা রচনা ও কাব্য-চর্চাই ছিল তাঁর সারা জীবনের হবি। হযরত খাজা (র) তাকে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যেন সে কাব্য-চর্চার মুকাবিলায় কুরআনুল করীমের সাধনাকেই উপরে স্থান দেয়। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ গ্রন্থে আমীর হাসান' আলা বলেন ঃ

بارها لفظ مبارك مخدوم شنيده آم مى بايد كه قران خواندن بر شعر كفتن غالب آيد

অর্থাৎ আমি আমার মখদূমের মুখ থেকে এ ধরনের কথা অনেকবারই শুনেছি যে, কবিতা আবৃত্তির তুলনায় কুরআনুল করীমের তেলাওয়াত অধিকতর হওয়া উচিত।[২]

অতঃপর তাকে কুরআন মজীদ হেফ্জ করার হেদায়াত দান করেন। এক-তৃতীয়াংশ হেফজ করতেই তিনি বললেন ঃ

ديگر ها اندك اندك ياد گير وياد گرفته بيشينه مكررمى كن

অর্থাৎ অল্প অল্প করে হেফ্জ কর আর হেফ্জকৃত অংশ বার বার দোহ্রাতে থাক।[৩]

---

১. বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন 'মুসলমানুকা নিজামে তা'লীম ও তরবিয়ত,' ২য় খণ্ড, মাওলানা মানাজির আহসান গীলানীকৃত;

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ২৪৯;

৩. ঐ, ৯৩ পৃ.

মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের সাহেবযাদা খাজা মুহাম্মদ হযরত খাজা (র)-এর পক্ষপুটে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। তাকেও তিনি কুরআন মজীদ হেফ্জ করান। খাজা মুহাম্মদ ইমাম ছিলেন, ছিলেন একজন ভাল হাফিজ এবং তাঁর এলহানও (কণ্ঠস্বর) ছিল অত্যন্ত মিষ্ট। তাঁকে তিনি সালাত আদায়ের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পঠিত কিরাত শুনে তাঁর চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত, আমেজ অনুভব করতেন তিনি।[১] তার অপর এক ভাই খাজা মূসাও ছিলেন একজন হাফিজ ও কারী। স্বাভাবিক নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি দস্তরখানের উপর বসতেন তখনই সর্বাগ্রে খাজা মুহাম্মদ এবং খাজা মূসা কুরআন মজীদের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতেন। একে দু'আয়ে মায়েদা বলা হ'ত।[২]

এরপর শুরু হ'ত খানা-পিনা। স্বীয় দৌহিত্র (ভাগিনার সন্তানগণ) খাজা রফী'উদ্দীন প্রমুখকেও কুরআন মজীদ হেফ্জ করিয়েছিলেন। তিনি নিজেও নফল নামাযে কুরআন শরীফ পড়তেন এবং বিশিষ্ট খাদেমদের থেকে জানতে চাইতেন যে, এ ব্যাপারে তাদের অভ্যাস ও আচরণ কি?

শায়খ (র)-এর সাথে সম্পর্ক

এমনিতেই কোন ব্যক্তি যদি কারো কাছ থেকে কোনরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় (যদি তার স্বভাব-প্রকৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রেরণা বিদ্যমান থাকে) তবে সে তার প্রতি অনুগত হয়ে থাকে এবং তাকে উপকারী বন্ধু মনে করে। হযরত খাজা (র)-এর স্বীয় মুরশিদের সাথে গভীর প্রেমপূর্ণ ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও আত্মিক উন্নতিতেও মুরশিদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই মেহনতের ফল এই হয়েছিল যে, যখন কোন মাহবুব (প্রেমাস্পদ)-এর প্রশংসা কীর্তন করা হ'ত তখনই তাঁর স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের স্মৃতি জাগরূক হয়ে উঠত এবং তাঁকেই তিনি এর সত্যতার মাপকাঠি মনে করতেন।

জামাতের ব্যবস্থাপনা ও দৃঢ় মনোবল

বার্ধক্যের শত দুর্বলতা এবং কঠোর কঠিন মুজাহাদা সত্ত্বেও জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেনঃ

"বয়স আশি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও জামাতের সাথেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। এজন্য উঁচু বালাখানা থেকে জামাতখানায়

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০০ পৃষ্ঠা;

২. ঐ, ১৯৯ পৃ.

অবতরণ করতেন এবং সেখানেই উপস্থিত দরবেশ ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে তা আদায় করতেন। বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও সর্বদা সিয়াম পালন করতেন। বিনা সিয়ামে খুব কম দিনই অতিবাহিত হ'ত।"[১]

শরীয়তের পাবন্দী এবং সুন্নতের অনুসরণ

হযরত খাজা (র) স্বয়ং সুন্নাতে রাসূল (স)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও কঠোর ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি স্বীয় সঙ্গী-সাথী ও খাদেমকুলকেও অত্যন্ত তাকীদ দিতেন। সুন্নত ছাড়াও মুস্তাহাব ও নফলও যাতে ফওত হতে না পারে সেজন্যও তাঁর কঠোর তাকীদ ছিল। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে হযরত খাজা (র) নিম্নরূপ উক্তি করেছেন ঃ

"রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুকরণ ও অনুসরণে অত্যন্তমযবুতি ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করা উচিত এবং এও দেখা উচিত যেন কোন মুস্তাহাব ও নফলও ফওত হতে না পারে"।[২]

"মাশায়িখে কিরামের জন্য এবং যিনি বায়'আত গ্রহণ করবেন (পীর) তাঁর জন্য শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং তরীকত ও হাকীকতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। তাহলে তাঁরা আর শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করার জন্য বলতে পারবেন না।"[৩]

---

১ সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ পৃ.;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৩১৮ পৃ.;

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৪৭ পৃ.;

পঞ্চম অধ্যায়

পরোপকার ও গভীর বিশ্লেষণ

জ্ঞানের মর্যাদা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বাতিনী 'ইলমে কামালিয়াত লাভের সাথে সাথে জাহিরী 'ইলমেও অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সেকালের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই তিনি দৃঢ় মনোবল, কঠিন অধ্যবসায় ও সুশৃংখলভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ ও মনীষীবৃন্দ রয়েছেন। সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ে তিনি প্রখ্যাত অডিটর জেনারেল শামসুল মুল্ক মাওলানা শামসুদ্দীন খারিযমী থেকে শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা কামালুদ্দীন যাহিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ মারিকলী থেকে হাদীসের দরস গ্রহণ করেন—যিনি ছিলেন 'মাশারিকুল আনওয়ার' প্রণেতা ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাগানীর শাগরিদ। একই মাধ্যমে তিনি 'হেদায়া' প্রণেতার শাগরিদও বটেন। তিনি কিছু কিতাব শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর নিকটও অধ্যয়ন করে 'ইলমের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক

যদিও স্বীয় প্রকৃতিগত মেধা এবং শায়খ-এর বাতিনী নিসবত (সম্পর্ক)-এর প্রভাবে তিনি দিন দিনই শব্দের মুকাবিলায় অর্থ, অর্থের মুকাবিলায় প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং নামের চেয়ে নামকরণের ভেতরেই বেশী নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, তথাপি জ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানের জন্য তাঁর নিষ্ঠা ও আস্বাদন শেষ অবধি অবিচল থাকে।

'সিয়ারুল আওলিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মাওলানা রুকনুদ্দীন চিগর 'আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীর 'কাশশাফ' ও 'মুফাসসাল' নামক প্রসিদ্ধ দু'টি

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ৩১৭

কিতাব এবং এ দু'টি ব্যতিরেকেও আরও কয়েকটি কিতাব হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর খাতিরে তাঁর খেদমতে নকল করে পৌছিয়েছিলেন।[১]এদু'টি কিতাবই সুপ্রসিদ্ধ মু'তাযিলী মনীষী 'আল্লামা মাহমূদ জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী) রচিত। প্রথমটি তফসীর গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ। এ থেকেও তাঁর জ্ঞানের প্রতি সীমাহীন নিষ্ঠা, প্রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থেই রয়েছে যে, সাইয়্যেদ খামুশ ইবনে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কিরমানী একান্ত সান্নিধ্যে 'খামসায়ে নিজামী' নামক গ্রন্থ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন।[১] হযরত খাজা (র)- এর সাহিত্যপ্রীতি এত বেশী গভীর ও পবিত্র ছিল যে, আমীর খসরুর মত একজন শীর্ষস্থানীয় নামযাদা কবিকেও (যিনি স্বীয় ক্ষেত্রে তুলনাহীন এবং ফারসী সাহিত্যের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম) তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছিলেন– করেছিলেন পথ-নির্দেশনা। সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রথম দিকে আমীর খসরু যে সব গযল গাইতেন সেগুলিকে হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর খেদমতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পেশ করতেন। একবার তিনি আমীর খসরুকে বলেছিলেন যে, গযল ইস্পাহানীদের পদ্ধতিতে গাইবে।[২]

হাদীছ ও ফিকাহর উপর দৃষ্টি ক্ষেপণ

সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের দরবারে সামা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে যে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে হযরত খাজা(র) উক্ত মাসআলার উপর যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন এবং এর উপর যে সমালোচনা পেশ করেছিলেন তা থেকেও তাঁর জ্ঞানগত মরতবা ও মর্যাদা এবং প্রশস্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে হযরত শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (র)-এর পূর্বে 'সিহাহ সিত্তা' হাদীছ গ্রন্থের তেমন পরিচিতি ও প্রচলন ছিল না এবং মানুষের পরিচিতি ও অবগতির সীমারেখা বুখারী ও মুসলিম শরীফের বাইরে অগ্রসর হতে পারেনি। হাদীসের মধ্যে 'মাশারিকুল আনওয়ার' ও 'মিশকাত শরীফ'কেই ইলমের পুঁজি এবং হাদীস শাস্ত্রের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ধাপ মনে করা হ'ত।[৩] সূফীদের মুখে মওযু' ও যঈফ হাদীছের আধিক্য ও ছড়াছড়ি এবং বুযুর্গদের মালফুজাত মজলিসগুলিতে বেদেরেগ বর্ণিত হ'ত। আজগুবী, মনগড়া ও মওযু'

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২১৯ পৃঃ

২. ঐ ৩০১ পৃঃ

৩. বিস্তরিত জানার জন্য দেখুন الثقافه الاسلاميه فى الهند এর হাদীছ অধ্যায়।

হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান 'আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনীর পূর্বে এখানে পরিদৃষ্ট হয় না। হযরত খাজা (র)-এর মালফুজাত ও জীবন-চরিত থেকে জানা যায় যে, তিনি এমনি ধরনের অনেক ভিত্তিহীন বর্ণনাকে (যা মুখ-নিঃসৃত ও সৃষ্ট) প্রমাণপঞ্জী হিসাবে পেশ করতেন না এবং তাঁর এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ছিল যে, সহীহ্ হাদীসের নির্বাচিত সংকলন হচ্ছে বুখারী ও মুসলিম। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, এই হাদীসটি কিরূপ–........................ السخی حبیب الله وان كان كافرا

'দাতা কাফির হলেও আল্লাহ্‌র দোস্ত।"

তিনি শুনে বললেন, এটা কোন হাদীস নয়, কোন ব্যক্তির কথিত উক্তি। এক ব্যক্তি আরয করল যে, এটা হাদীস আরবা'ঈনের অন্তর্গত অন্যতম হাদীস। তিনি বললেন, যা কিছু বুখারী ও মুসলিমে আছে সেগুলিই সহীহ্।[১]

ইল্‌মের গুরুত্ব

স্বীয় মাশায়িখে কিরামের মতই হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর দৃষ্টিতেও ইল্‌মের অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল এবং তিনি একে আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের (সালেকীন) জন্য এবং যে সমস্ত লোক হেদায়াত ও তরবিয়তের খেদমত আঞ্জাম দেন তাঁদের জন্য অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন।

বাংলার একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান যুবক–যিনি পরে আখী সিরাজুদ্দীন নামে মশহূর হয়েছিলেন এবং যিনি পাণ্ডুয়ার মশহূর 'আলিম, চিশতীয়া খানকাহ্‌র

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১০৩ পৃঃ

এ ক্ষেত্রে একটা কথা প্রকাশ করে দেওয়া দরকার যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বুখারী ও মুসলিমের মরতবা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এমন মনে হয় যে, সিহাহ্ সিত্তা সাধারণভাবে এবং বুখারী ও মুসলিম বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচলন না হওয়ার কারণে এর সাথে 'উলামায় কিরামে ও বুযুর্গ মাশায়িখ সম্পৃক্ত ছিলেন না; স্বয়ং তিনিও (যদি বিতর্ক সভার রোয়েদাদ সঠিক হয় তবে) বিতর্ক সভায় যে হাদীসগুলিকে সামা হালাল হবার সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন সেগুলি কোন সিহাহ্ সিত্তা গ্রন্থেই নেই। তদুপরি মুহাদ্দিসগণের নিকটও হাদীসগুলির মান এমন কিছু উঁচু নয়। বিপক্ষীয় উলামায়ে কিরামও যাঁদের অধিকাংশই সে যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিম-'উলামা এবং বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন–যেভাবে আলোচনা ও দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন তা থেকে 'ইল্‌মে হাদীসে তাঁদের অজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ পায়নি, বরং একজন 'আলিমে দীনের এ ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল সে ক্ষেত্রেও ঘাটতি অনুভূত হয়। সহীহ হাদীস গ্রন্থ, মনগড়া ও আজগুবী হাদীস এবং হাদীস শাস্ত্রের ন্যায়ানুগ ও আপত্তিকর বিষয়াবলী প্রকাশিত না হবার কারণে খানকাহ্গুলিতে এমন অনেক রসম-রেওয়াজ, এমন কি সিজদা তা'জিমী প্রচলিত ছিল এবং বহুবিধ রেওয়ায়েত বিভিন্ন দিন ও মুহূর্তের ফযীলত সম্পর্কে মশহূর ছিল। এগুলি মাশায়িখে কিরামের মালফুজাতগুলিতে অত্যন্ত জোরেশোরে বর্ণনা করা হয়েছে–হাদীসের সহীহ্ সংকলন-গুলিতে যার কোনই অস্তিত্ব নেই এবং মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেছেন। এসব সামনে রেখেই মুহাদ্দিসকুল ও তাঁদের নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে যাঁরা ভারতবর্ষে হাদীস শাস্ত্র প্রচার এবং সহীহ ও যঈফ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

প্রতিষ্ঠাতা ও হালকার মধ্যমণি ছিলেন-লাখনৌতি থেকে মুরীদ হবার নিয়তে দিল্লী আসেন এবং হযরত খাজা (র)-এর মুরীদ হন। তিনি মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবীকে বলেছিলেন, 'এই যুবক অত্যন্ত যোগ্যতার অধিকারী। যদি কিছু জাহিরী 'ইল্‌ম হাসিল করতে পারে তবে দরবেশীতে সে সুদৃঢ় অবদান রাখতে পারবে'। এ কথা শুনে মাওলানা ফখরুদ্দীন আরয করেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে তাকে কিছু দিন আমার সাহচর্যে রেখে জরুরী মাসআলা-মাসায়েল তালীম দিয়ে দিতে পারি। এতে তিনি বললেন, সে আপনার সোহবতের সবচেয়ে বড় হকদার। এরপর মাওলানা ফখরুদ্দীন তাকে নিজের সাথে নিয়ে যান এবং অল্প দিনেই দরকারী 'ইল্‌মের সঙ্গে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করে তোলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর ওফাতের পর 'ইল্‌মে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য উক্ত হযরত কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করেন। অতঃপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্ব বাংলায় চিশতীয়া-নিজামিয়া সিলসিলার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১]

গভীর জ্ঞানরাজি ও প্রবন্ধাদি

জাহিরী ও বাতিনী 'ইল্‌মের ব্যাপকতা, ইখলাস, নিবিষ্টচিত্ততা ও মুজাহাদার ভিত্তিতে তিনি লাভ করেছিলেন গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশ্লেষণাত্মক ও পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা যা সাধারণত কামিল ওলী-আওলিয়া ও মহান একনিষ্ঠ সাধকদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যা অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও ইখলাসের অনিবার্য পরিণতি-তাসাওউফপন্থীরা যাকে ইল্‌মে লাদুন্নীর সমার্থক মনে করেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন, 'ইল্‌ম সম্পর্কিত যখনই কোন আলোচনা হ'ত কিংবা সমস্যা-দেখা দিত তখনই তিনি বাতিনী নূরের আলোকে তার সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতেন।

তিনি উক্ত সমস্যার উপর এমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন যে, হাযিরানে মজলিস বিস্মিত হয়ে যেত এবং একে অপরকে বলত যে, এটাতো কোন কিতাবী জবাব নয় বরং তা রব্বানী ইলহাম এবং 'ইল্‌মে লাদুন্নীর ফয়েয। এরই ভিত্তিতে শহরের শ্রেষ্ঠতম 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা 'ইল্‌মে তাসাওউফ অস্বীকার করতেন এবং তাসাওউফপন্থীদের যারা কট্টর বিরোধী ছিলেন তারাও হযরত খাজা (র)-এর ভক্তে পরিণত হন এবং লজ্জিত হন নিজেদের জ্ঞানের পরিমাপে ও অহমিকায়।

---

১. সিয়ারুল আরিফীন ইত্যাদি;

শরীয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান

জ্ঞানের এই গভীরতা, সুন্নতের অনুসরণ এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল আস্থা তাঁর মন-মগজকে এতখানি শান্ত, সুস্থ, সোজা-সরল বানিয়েছিল যে, তাসাওউফপন্থীদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় দীর্ঘকাল থেকে প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ চলে আসছিল এবং অনেক স্থানেই তা তাসাওউফপন্থীদের রীতি-নীতি ও স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) সুস্থ মন-মগজে সে সব গ্রহণ করতেন না। তাঁর রুচি, প্রকৃতি ও পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ছিল এর খেলাফ ও পরিপন্থী।

তাসাওউফপন্থী শিবিরে বহু দিন থেকে এ ধারণা চলে আসছিল যে, বিলায়েত নবুওতের তুলনায় সর্বোত্তম এবং আওলিয়ার মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কিরামের থেকে বেশী। কেননা বিলায়েত মা'বুদে হাকীকীর সঙ্গে গভীর সম্পৃক্তি এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির নাম। অপরদিকে নবুওতে (দা'ওয়াত ও তবলীগের কারণে) সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। অতঃপর এর মধ্যেও আরও কয়েকটি দল-উপদল সৃষ্টি হয়ে গেছে। এদের কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের বিলায়েত নবুওতের দর্জা থেকে উত্তম। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) কিন্তু এসব মতবাদ স্বীকার করতেন না। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, হযরত খাজা (র) বলেছেন, এমত মাযহাব বাতিল ও ভ্রান্ত এবং তা এই কারণে যে, যদিও আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন তার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তও আওলিয়া কিরামের সমস্ত সময়-ক্ষণ থেকে বেশী মর্যাদার দাবি রাখে।[১]

হালাল বস্তু আল্লাহ্র পথের প্রতিবন্ধক নয়

তাসাওউফ সম্পর্কে সাধারণভাবে এটাই বুঝানো হয়েছে ও মশহূর করে দেওয়া হয়েছে যে, তাসাওউফ মানেই নিঃসঙ্গ, বেকার তথা কর্মহীন জীবন, আর কর্মব্যস্ততা হচ্ছে আল্লাহ্র মিলনপথের প্রতিবন্ধক তথা আধ্যাত্মিক সাধন পথের জন্য বিষবৎ। হযরত খাজা (র) 'ইল্মে মা'রিফাত ও হাকীকতের যে মকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উপায়-উপকরণ ও রসম-রেওয়াজ তথা আচার-অনুষ্ঠানের

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১২০ পৃষ্ঠা। ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র) এতটুকু বাড়িয়েছেন যে, আম্বিয়া কিরাম ঠিক যে মুহূর্তে সৃষ্টি জগত নিয়ে ব্যস্ত ও সম্পৃক্ত থাকেন সে অবস্থায়ও তাঁরা আওলিয়াদের আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মুহূর্ত থেকেও আল্লাহ্র প্রতি অধিক নিবিষ্ট ও সম্পৃক্ত থাকেন। সৃষ্টির প্রতি তাদের সম্পৃক্ততা যেহেতু আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে সেহেতু আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ততা ঐশী আদেশের সমার্থক হয়ে থাকে।

ঊর্ধ্বে উঠে পরম লক্ষ্য ও আরাধ্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তার অর্থ এটাই ছিল যে, তিনি সে পর্যায়কে পেছনে ফেলে বহু দূর সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বৈধ ও শরা'সম্মত কার্যকলাপের আলোকোজ্জ্বলতা ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উপনীত হওয়া তাঁর দৃষ্টির আওতায় ছিল। হযরত খাজা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গেসূ দরায-এর মালফুজাত 'জাওয়ামি'উল- কালিম'-এ বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বলেছেন: কোন জিনিস যা বৈধ তা আল্লাহ্‌র পথে নিষিদ্ধ ও অধ্যাত্ম সাধনার পথে প্রতিবন্ধক নয়। অন্যথায় তা কখনই শরীয়তে বিধেয় ও বৈধ হ'ত না।[১]

কলব (আত্মা) আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হলে কোন বস্তুই ক্ষতিকর নয়

একবার হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বললেন: আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্টচিত্ত ও পবিত্র আত্মার দরকার। এরপর যে কাজেই থাক, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।[২]

দুনিয়া পরিত্যাগের হাকীকত

দুনিয়া পরিত্যাগের অর্থ এটা নয় যে, কেউ নিজেকে নগ্ন করে দেবে অর্থাৎ নেংটি পরে বসে যাবে ধ্যানে; বরং এর সঠিক অর্থ এই যে, সে কাপড়ও পরবে, খানাও খাবে এবং যখনই যা কিছু জুটবে তাকে কাজেও লাগাবে, কিন্তু তা কখনই পুঞ্জীভূত করবে না এবং নিজের অন্তর-মানসকে কোন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না। আর এটাই দুনিয়া পরিত্যাগের অর্থ।[৩]

বাধ্যতামুলক ও ইচ্ছাধীন আনুগত্য

তিনি আরও বলেন, আনুগত্য দুই প্রকার : বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন। বাধ্যতামূলক আনুগত্য বলতে বুঝায় তাকেই যার উপকারিতা আনুগত্য পোষণকারীর উপর গিয়ে বর্তায়; যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও তসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি। ইচ্ছাধীন আনুগত্য বলতে তাকেই বুঝায় যার উপকারিতা, শান্তি ও কল্যাণ অন্যেরা লাভ করে। যেমন, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, স্নেহ-প্রীতি, অন্যের সঙ্গে সদয় ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলিকে ইচ্ছাধীন আনুগত্য বলা হয়ে থাকে এবং এর ছওয়াবও অপরিসীম ও অপরিমেয়।

---

১. জাওয়ামি'উল কালিম, ১৬০ পৃ.;

২. অর্থাৎ শরা'সম্মত জীবনোপকরণ এবং প্রকাশ্য কাজ-কর্ম ইত্যাদি।

৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৭;

বাধ্যতামূলক আনুগত্য গ্রহণীয় হবার জন্য বেশি প্রয়োজন ইখলাসের এবং ইচ্ছাধীন আনুগত্য যেভাবেই করবে ছওয়াব মিলবে।[১]

কাশ্‌ফ ও কারামত আল্লাহ্‌র পথের অন্তরায়

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) আরও বলেছেন যে, ওলী-আওলিয়া থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা তাঁদের নেশা ও মত্ততার পরিণতি। তা এই জন্য যে, তাঁরা নেশাধারী। অপর দিকে আম্বিয়ায়ে কিরাম সহীহ্ ও সঠিক বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর জন্য কাশ্‌ফ ও কারামত অধ্যাত্ম্য সাধনা পথের অন্তরায়স্বরূপ। মুহব্বত দ্বারাই দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।[২]

আওলিয়া ও আম্বিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান

তিনি আরও বলেন যে, মরতবার স্তর তিনটি: তন্মধ্যে প্রথম মরতবা যাকে অনুভূতির পরিমাপ বলা হয়, দ্বিতীয়টিকে বুদ্ধির পরিমাপ এবং তৃতীয়টিকে পবিত্রতার পরিমাপ বলা হয়। অনুভূতির পরিমাপের অন্তর্গত বিষয়াদির মধ্যে খানাপিনার যাবতীয় দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি অনুভবযোগ্য বিষয়াদি পরিগণিত। এরপর 'আকল তথা বুদ্ধিগত পরিমাপ যার সম্পর্ক দুটি 'ইল্‌মের সঙ্গে ঃ একটি অর্জিত এবং অপরটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু 'আলমে কুদ্‌সে পৌঁছে বুদ্ধির সাহায্যে লব্ধ যে কোন ইল্‌মই সর্বজনস্বীকৃত বলে মালুম হতে থাকে। অতঃপর তিনি আরও বলেন যে, যার উপর 'আলমে কুদসের দরওয়াজা খুলে যায় তার 'আলামত কি হতে পারে? যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে (আলমে 'আকল) থাকেন এবং তিনি কোন কোন মাসআলাকে সর্বজনস্বীকৃত অথবা অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করেন এবং এর থেকে তিনি এক প্রকার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে থাকেন তিনি 'আলমে কুদসের রাস্তা পান না। এ ক্ষেত্রে তিনি জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, অদৃশ্য জগতে থেকে কিছু জ্ঞান ও ঘটনাবলী মনের উপর দিয়ে বয়ে যায়। আল্লাহ চাহে তো আমি সেসব লিখব। এরপর তিনি অনেক কিছুই লিখলেন। অতঃপর বললেন, অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, কিন্তু যা ছিল আসল উদ্দেশ্য তা লিপিবদ্ধ করা গেল না।[৩]

দুনিয়ার মুহব্বত ও দুশমনী

একদিন আলোচনা হচ্ছিল যে, কারও দুনিয়ার প্রতি মুহব্বত সৃষ্টি হয়ে থাকে আর কারও হয়ে থাকে ঘৃণা। তিনি বললেন, তিন ধরনের লোক রয়েছে ঃ

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ পৃ ১৪;

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৩৩;

৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৬৯;

কিছু লোক রয়েছে যারা দুনিয়ার সঙ্গে মুহব্বত রাখে এবং দিন-রাত এর চিন্তা-ভাবনা ও স্মরণে থাকে। এদের সংখ্যা বহু। কিছু লোক এমনও আছে যারা দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে এর নাম উচ্চারণ করে এবং সর্বদাই এর দুশমনীতে লিপ্ত থাকে। তৃতীয় প্রকার লোক যারা না দুনিয়ার সাথে মুহব্বতের সম্পর্ক রাখে আর না রাখে ঘৃণার সম্পর্ক এবং দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে না মুহব্বতের সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করে, আর না ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে। এরা প্রথমোক্ত দুই প্রকারের চেয়ে ভাল। এরপর তিনি একটি কাহিনী শোনালেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত রাবিআ বসরী (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দুনিয়াকে ভীষণ নিন্দাবাদ করতে লাগল। হযরত রাবিআ বসরী (র) তাকে বললেন, মেহেরবানী করে এরপর আর এখানে আসবেন না। মনে হচ্ছে আপনি দুনিয়াকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এজন্য দুনিয়ার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন।[১]

তেলাওয়াতে কালামে পাকের মরতবা

একবার তিনি তেলাওয়াতে কুরআন পাকের মরতবা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: প্রথম মরতবা এই যে, যা কিছু পড়বে তার অর্থ হৃদয়ে অনুভূত হবে। দ্বিতীয় মরতবা এই যে, তেলাওয়াতকালীন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র 'আজমত ও শান-শওকত মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং তৃতীয় মরতবা, তেলাওয়াতকারীর অন্তর-মানস আল্লাহ্‌কে নিয়ে মশগুল ও সম্পৃক্ত হবে।

তিনি বললেন, কুরআন পাঠকালীন নিদেনপক্ষে এতটুকু বোধশক্তি তো প্রতিটি ব্যক্তিরই থাকা উচিত, 'আমি এই নিয়ামতের কতখানি হক্‌দার ছিলাম, আর এই মূল্যবান সম্পদ লাভের এমন ভাগ্যই বা আমার ছিল কোথায়?' যদি এসব হাসিল না হয় তবে তেলাওয়াতকালীন যে ছওয়াব ও পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে তা স্মৃতিপটে জীবন্ত ও ভাস্বর করে ধরে রাখা দরকার।[২]

যদিও হযরত খাজা (র), যেমন তিনি কয়েকবারই বলেছেন, কোন লিখিত গ্রন্থ রেখে যান নি,[৩] কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গ্রন্থরাজি তাঁরই হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাঁরই সাহচর্যে ধন্য ও গৌরবান্বিত সেই সমস্ত মহান খলীফা ও নামযাদা সঙ্গী-সাথীবৃন্দ যাঁরা বিশুদ্ধ আমল ও সঠিক নির্ভেজাল 'ইল্‌মের বাস্তব প্রতিমূর্তি

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ১৮৯।
২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৭১।
৩. ঐ. পৃষ্ঠা ৪৫; এবং খায়রুল মাজালিস, ২৫;

ছিলেন এবং যাঁদের অন্তরের সহজ সারল্য, জ্ঞানের গভীরতা ও উপলব্ধির পরিপক্কতা কুরআনুল করীমে বর্ণিত راسخين فى العلم শানের অনুরূপ ছিল। আমীর হাসান 'আলা সিজযীর ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ এবং আমীর খোরদ-এর সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর বহু বাণী ও মালফুজাত বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে তাঁর শান-শওকতের প্রকাশ ঘটেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফয়েয ও বরকত

ঈমানের নব জাগরণ এবং 'আম তওবাহ্

ঐ সমস্ত ফয়েয ও বরকত সম্বন্ধে বর্ণনা করার পূর্বে যা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ ও তওবাহ করার মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলমান লাভ করেছিল এবং এমন এক যুগে যখন মুসলিম হুকূমত সৌভাগ্যের স্বর্ণ-শিখরে আসীন এবং গাফিলতী, আল্লাহ্-বিমুখতা, আত্মপূজার উপায়-উপকরণের ছিল পূর্ণ যৌবন–এমন একটি নতুন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যাকে প্রতিটি অনুভবকারী ব্যক্তিই অনুভব করেছেন– সমীচীন মনে হচ্ছে যে, তরীকতের বুযুর্গগণের সাধারণ বায়'আত, জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন, ইসলামের উপদেশ প্রদান, তওবাহ্‌র হিকমত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে দেওয়া যাক যেন জানা যায় যে, কোন্ অবস্থা ও অনিবার্যতার কারণে এমত তরীকা ও পদ্ধতি এখতিয়ার করা হয়েছিল এবং এর দ্বারা কি ধর্মীয় কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা গেছে। বর্তমান লেখক "তারীখে দা ওয়াত ওয়া 'আযীমত"-এর প্রথম খণ্ডে হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানী (র) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয় যা কিছু লিখেছিলেন প্রথমে সেটাকেই কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও ছাট-কাট করে উদ্ধৃত করছি ঃ

"শ্রেষ্ঠ যুগসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জনবসতির বিস্তৃতি, জীবনের দায়িত্ব এবং জীবিকার চিন্তা-ভাবনা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, বিশিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ শুদ্ধি-সংস্কার ও প্রশিক্ষণের কাজ নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং বৃহৎ পরিমাপের কোন ধর্মীয় ও আত্মিক বিপ্লবের আশা-ভরসাও করা যেত না। অতএব তখন সামনে এমন কোন্ পন্থা-পদ্ধতিই বা খোলা ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যায় নিজেদের ঈমানের পুনর্জাগরণ ঘটাবে, ধর্মীয় দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাসমূহকে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি ও উপলব্ধির সঙ্গে পুনরায় কবুল করবে যাতে করে তাদের মধ্যে নিজেদের ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়,

বিমর্ষ ও মৃত অন্তর-মাঝে পুনরায় প্রেমের উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তাদের ক্লান্ত ও দুর্বল দেহে পুনরায় চলার শক্তি ও প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, কোন একনিষ্ঠ আল্লাহভীরু বান্দার প্রতি তাদের আস্থা দৃঢ় হয় এবং তাঁর থেকে আত্মিক ও প্রবৃত্তিজাত রোগ-ব্যাধিতে সুচিকিৎসা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সঠিক আলো ও পথ-নির্দেশনা লাভ সম্ভব হয়। পাঠকরা নিশ্চয় ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছেন যে, যে ইসলামী হুকুমতের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল হেদায়াতের পথ দেখাবার, সে হুকুমত তার দায়িত্ব পালনে শুধু উদাসীন হয়েই যায় নি বরং তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের আমল ও কৃতকর্মও সে-কাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সে পথের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে তারা এমন বদগুমান, খেয়াল-খুশীর পূজারী ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল যে, নতুন কোন সংগঠন এবং নতুন কোন দাওয়াত কিংবা আহবান যার ভেতর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সামান্য মাত্র গন্ধও পাওয়া যেত তারা সেটাকে বরদাশ্‌ত করতে পারত না, সঙ্গে সঙ্গেই তা নির্মূল করে দিত। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন ধর্মীয় জীবন, নতুন নিয়ম-শৃংখলা এবং একেবারে গোড়া থেকে নতুনভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করবার জন্য এছাড়া আর কোন্ পন্থা অবশিষ্ট ছিল যে, আল্লাহ্‌র কোন ভক্ত ও একনিষ্ঠ বান্দাহ হুযূর আকরাম (স)-এর প্রবর্তিত তরীকার উপর ঈমান ও আমল তথা শরীয়ত অনুসরণের বায়'আত নেবেন এবং মুসলমান তাঁর হাতের উপর হাত রেখে নিজেদের পূর্ব অলসতা ও জাহিলিয়াতের জীবন থেকে তওবাহ করবে– করবে ঈমানী চেতনার পুনরুজ্জীবন–অতঃপর সেই নায়েবে রাসূল তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দিবেন, নিজের মূল্যবান প্রভাবমণ্ডিত সাহচর্য, স্বীয় প্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়তা ও স্বীয় প্রাণের উষ্ণতা থেকে পুনরায় ঈমানী উত্তপ্ততা, উষ্ণ প্রেম, একনিষ্ঠতা ও একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সকল কিছু করবার মানসিকতা, সুন্নতে নববী অনুসরণের আবেগ-উদ্দীপনা এবং পারলৌকিক জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন? তাদের এই নতুন সম্পর্ক থেকে অনুভূত হোক যে, তারা একটি জীবন থেকে তওবাহ করছে এবং সম্পূর্ণ নতুন আর এক জীবনে পদার্পণ করছে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় এমন এক বান্দাহ্‌র হাতের উপর হাত রেখে দিয়েছে যিনি অনুভব করেন যে, ঐ সমস্ত বায়'আতকারীর সংশোধন, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং তাদের দীনী খেদমত আল্লাহ্ পাক আমার উপর সোপর্দ করেছেন, আর এই মুহব্বত ও আস্থার কারণে আমার উপর এক নয়া দায়িত্ব বর্তেছে। অতঃপর তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও গবেষণা এবং কুরআনুল করীম ও সুন্নতে নববী (র)-এর মূলনীতি ও শিক্ষা মুতাবিক তাদের ভেতর রূহানী ভাবধারা ও তাকওয়া এবং তাদের জীবনে ঈমান, গভীর প্রত্যয়, ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা এবং তাদের

আমল ও অবস্থার ভেতর ঈমানী ভাবধারা ও প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করতে প্রচেষ্টা চালাবেন। এটাই প্রকৃত হাকীকত সেই সব বায়'আত ও প্রশিক্ষণের যা ধর্মের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগগণ যুগে যুগে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং মুসলমানদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজে পরিচালনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র লাখ লাখ বান্দাকে ঈমানের হাকীকত ও ইহসানের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।"[১]

বায়'আত একটি অঙ্গীকার ও পারস্পরিক ওয়াদা পালনের নাম

বায়'আত পেছনের সমস্ত গুনাহ্ থেকে তওবাহ এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (স)-এর বিধি-বিধান প্রতিপালন এবং সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ করবার পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিরই নাম। সুলতানুল মাশায়িখ (র) বায়'আত গ্রহণ করার সময় বায়'আতকারীদের থেকে কি শপথ উচ্চারণ করাতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কি অঙ্গীকারই বা নিতেন, কোন জীবনী গ্রন্থেই তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) স্বয়ং স্বীয় শায়খ ও মুরশিদ শায়খুল কবীর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর বায়'আত নেবার তরীকা এবং তাঁর উপদেশাবলীর আলোচনা করেছেন এবং স্বীয় শায়খ-এর সাথে তাঁর যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল–ছিল তাঁকে অনুসরণের যে আবেগ ও প্রেরণা –তা থেকে এ ধারণাই করা চলে যে, তিনিও তেমনিই স্বীয় মুরীদবর্গকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করে থাকবেন।

তিনি বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি শায়খুল 'আলম শায়খ ফরীদুদ্দীন -এর খেদমতে মুরীদ হবার নিয়তে আসত, তিনি তাকে বলতেন, একবার সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়। এরপর সূরা বাকারার শেষ রুকু' امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াতেন। অতঃপর ان الدين عند الله الاسلام ..... شهد الله انه لا اله الا الله পর্যন্ত পড়াতেন। এরপর বলতেন, "তোমরা এই দুর্বলের হাতের উপর বায়'আত করে তাঁর শায়খ-এর হাতের উপর এবং (এই ধারাক্রম অনুসারে) হযরত পয়গম্বর (স)-এর মুবারক হাতের উপর ও আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদিগারে 'আলমের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলে যে, নিজেদের হাত, পা ও চোখকে হেফাজত করবে এবং শরীয়ত-নির্দেশিত পথ ও পন্থাসমূহে কায়েম থাকবে।"

বায়'আতের এই শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে ইসলামের বুনিয়াদী 'আকীদাসমূহ যেমন এসে গেছে– তেমনি এসে গেছে "শুনব ও অনুসরণ

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৩২৬;

করব”-এর ওয়াদা ও অভিপ্রায়ের কথাও। একথাও এসে গেছে যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে একমাত্র মনোনীত ও গৃহীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এর দ্বারা এ অনুভূতিও জাগ্রত করে দেওয়া হ'ত যে, এই বায়'আত প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (র)-এর পবিত্র হাতের উপরই করা হয়েছে এবং শায়খ-এর হাত সেই মুবারক হাতেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর সঙ্গেও অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, বায়'আতকারী তার হাত, পা ও চোখকে পাপরাশি থেকে হেফাজতে রাখবে এবং শরীয়ত নির্দেশিত পথের উপর নিজেকে কায়েম রাখবে। ঈমানের পূনর্জাগরণ এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)-এর সঙ্গে নিজের অঙ্গীকার প্রতিপালনের এর চাইতে উত্তম বোধগম্য তরীকা আর কী হতে পারে? এটা তো বলা যায় না যে, বায়'আতকারীদের শতকরা একশ' ভাগ এ প্রতিজ্ঞার উপর কায়েম থাকত। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বায়'আতকারীদের একটি বিরাট অংশ এই স্বীকোরোক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করত এবং আল্লাহ্‌র হাযার হাযার লাখ লাখ বান্দাহ্ এই ঈমানী পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবাত্মক অবস্থার মাধ্যমে নিজেদের শুধরে নিত।

সাধারণ ও ব্যাপক বায়'আত-এর হিকমত

সাধারণ গণমানুষকে বায়'আত ও হেদায়াতের লক্ষ্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত বুযুর্গ যে খোলাখুলি ও সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন এবং যেভাবে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাছাই মনোনয়ন ছাড়াই লোকদের অনুমতি ছিল যে, তারা বায়'আত গ্রহণ করুক এবং মুরীদ দলভুক্তদের কাতারে শামিল হোক, বিশেষ করে হযরত খাজা (র)-এর দরবারে এ অধ্যায়ে যে প্রশস্ত ও উদার সুযোগ-সুবিধা ছিল, তাতে কারও কারও মনে খট্‌কা সৃষ্টি হতে পারে যে, বায়'আত যখন একটি অঙ্গীকারের নাম এবং এর সম্পর্ক যখন গোটা জীবনের সঙ্গে জড়িত তখন এতে এত খোলামেলা ও উদারতার সুযোগ রাখা হ'ল কেন? হযরত খাজা (র) একবার নিজেই এর উত্তর দিয়েছিলেন এবং এরূপ সাধারণ অনুমতির হিকমত বর্ণনা করেছিলেন।

মাওলানা যিয়াউদ্দীন বার্নী (তারীখ ফীরূযশাহীর প্রণেতা) বলেন যে, আমি একদিন সুলতানুল মাশায়িখের খেদমতে হাযির ছিলাম। ইশরাক থেকে চাশ্‌ত পর্যন্ত আমি তাঁর হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা শুনতে থাকি। ওই দিন বিশেষ করে অনেক লোকই বায়'আত গ্রহণ করে। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হ'ল যে, পূর্ব যামানার বুযুর্গগণ মুরীদ করবার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু সুলতানুল মাশায়িখ (র) স্বীয় বদান্যতা ও করুণার কারণে এক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি সাধারণ ও

বিশিস্ট সবাইকে মুরীদ বানিয়ে নিচ্ছেন। আমি চাইলাম যে, এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করি। সুলতানুল মাশায়িখ স্বীয় কাশ্‌ফ দ্বারা আমার জিজ্ঞাসা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেনঃ

"মাওলানা যিয়াউদ্দীন! সব ধরনের কথাই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাক। কিন্তু এটাতো জানতে চাও না যে, কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই যে-কোন আগত ব্যক্তিকেই কেন আমি মুরীদ করি!"

একথা শোনার পর আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হ'ল আর আমি তাঁর পা আঁকড়ে আরয করলাম যে, বেশ কিছু কাল থেকে আমার অন্তরে এই সমস্যা তোলপাড় করে ফিরছিল এবং আজও এ ওয়াসওয়াসা আমার মনে এসেছিল। আল্লাহ্ পাক আপনার মনে একথার উদয় ঘটিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক যুগে স্বীয় অপার ও পরিপূর্ণ হিকমতের একটি বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এর পরিণাম এই যে, প্রতিটি যুগের লোকজনের জীবনযাপন পদ্ধতি ও আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং তাদের মেযাজ ও প্রকৃতি অতীত যুগের লোকদের প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে মিল খায় না। অল্প লোকের মধ্যেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আর এটা অভিজ্ঞতারই ফসল। মূরীদ হবার আসল উদ্দেশ্য তো এটাই যে, মুরীদ আল্লাহ ব্যতীত আর সমস্ত কিছুর সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত ও তাঁর প্রতি সমর্পিত করবে যেমনটি তাসাওউফের কিতাবগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পূর্ব যামানার বুযুর্গগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুরীদের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপর সকল কিছুর সঙ্গে এই সম্পর্কচ্যুতি না লক্ষ্য করতেন বায়'আতের জন্য হস্ত প্রসারিত করতেন না। কিন্তু সুলতান আবু সা'ঈদ আবুল খায়ের-এর রাজত্বকাল থেকে বুযুর্গ শ্রেষ্ঠ শায়খ ফরীদুল হক ওয়াদ্দীন (কু. সি.)-এর সময় কাল পর্যন্ত এ সমস্ত মহান বুযুর্গ ছিলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভীড় এঁদের দরওয়াজায় লেগেই থাকত এবং উঁচু-নীচু প্রতিটি শ্রেণীর লোকই সেখানে সমবেত হ'ত। ঐ সমস্ত আল্লাহ্‌র বান্দা পারলৌকিক দায়িত্বানুভূতির কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে এই সব আল্লাহ-প্রেমিক লোকদের আশ্রয় আঁকড়ে ধরতে চাইল। ঐ সব মহান বুযুর্গ সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বশ্রেণীর লোকদেরই বায়'আত কবুল করেছেন এবং খিরকায়ে তওবা ও তাবারুক দান করেছেন।

"এখন আমি তোমার সওয়ালের জবাব দিচ্ছি--আমি কেন মুরীদ করবার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করি না এবং নিজেকে নিশ্চিন্ত করি না। এর একটি কারণ এই যে, আমি ধারা-পরম্পরা শুনে আসছি যে, বহু লোক মুরীদ

হবার পর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তওবাহ্ করে প্রত্যহ্ নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করতে থাকে এবং অন্যান্য নফল 'ইবাদত-বন্দেগীতেও নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এখন আমিও যদি শুরু থেকেই এ ব্যাপারে শর্ত আরোপ করি যে, তার ভেতর মুরীদ হবার হাকীকত (প্রকৃত তাৎপর্য) অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন যাবতীয় বস্তু থেকে সম্পর্কচ্যুতির নজীর পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং তাকে তওবাহ্ ও পবিত্রতার খিরকা না দেই, তবে তারা কল্যাণের এ পরিমাণটুকুও –যা ঐ সমস্ত বান্দার কারণে তাদের ভেতর আসছে–তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি দেখছি যে, একজন মুসলমান অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে ও বিনয়-নম্রভাবে আমার নিকটে আসে এবং বলতে থাকে যে, সে সমস্ত গুনাহ থেকে তওবাহ করেছে। আমি তার কথা সত্য মনে করে তাকে বায়'আত করে নেই। বিশেষ করে এজন্য যে, বহু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনি যে, অনেক বায়'আতকারীই এই বায়'আতের কারণে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে।"[১]

জনজীবনে এর প্রভাব

এই বায়'আত ও সম্পর্ক যদ্দ্বারা মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী সমভাবে উপকৃত ও কল্যাণমণ্ডিত হ'ল, সাধারণ জীবন-যিন্দেগী ও সামাজিক জীবন, জনগণের চরিত্র-অভ্যাস, কাজ-কর্ম ও সময়ের গতিধারার উপর এবং শাসকশ্রেণী থেকে শুরু করে শ্রমজীবী শ্রেণী পর্যন্ত মানুষের সামগ্রিক অবস্থার উপর এর কি প্রভাব পড়ল এবং রাজধানী দিল্লীতে যেখানে সারা ভারতবর্ষের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আর শত শত নয়, হাযার হাযার বছরের ধনভণ্ডারের সোন-দানা ও হীরা-জহরত, শিল্পী ও কারিগরদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত কোণ থেকে উপহার-উপঢৌকন, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্লাবনের ন্যায় আছড়ে পড়ছিল, সেখানে দীনদারী, আল্লাহ-সন্ধানী, ঐশী প্রেম, তওবাহ্ ও আল্লাহ্র নৈকট্য, পারস্পরিক লেন-দেন, পরিচ্ছন্নতা, স্পষ্ট ভাষণ এবং আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কেমনতরো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সে যুগের বিজ্ঞ দূরদর্শী ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বার্নীর মুখেই শুনুন। তিনি সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ[২]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮–মাওলানা যিয়াউদ্দিন বার্নীর 'হাসরতনামা'র বরাত দিয়ে উদ্ধৃত।

২. তারীখে ফীরুযশাহীর উদ্ধৃত অংশের এ অনুবাদ সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন রাহমান এমএ (রফীক, দারুল মুসান্নিফীন) এর গ্রন্থ 'বযমে সূফিয়া' থেকে কাটছাঁট করে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১০৯-২০২।

"সুলতান 'আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের বুযুর্গগণের মধ্য থেকে তাসাওউফের পদ শায়খুল ইসলাম হযরত নিজামুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম 'আলাউদ্দীন এবং শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন দ্বারা অলংকৃত ছিল। দুনিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মার দ্বারা বরকতময় ও সমৃদ্ধিশালী হয় এবং তাঁদের হাতে বায়'আত করে, তাঁদের সাহায্যে-সহযোগিতায় পাপী ও গুনাহগার লোকেরা তওবাহ্ করে, হাযার হাযার পাপাচারী, বদকার ও বেনামাযী তাদের অন্যায় ও পাপাচার থেকে নিজেদের ফিরিয়ে রাখে এবং চিরদিনের জন্য তারা সালাতের পাবন্দ হয়ে যায় এবং গোপনীয়তার সঙ্গে ধর্মীয় কার্যকর্লাপের প্রতি আবেগ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে। তাদের তওবাহ হয়েছিল সহীহ ও বিশুদ্ধ। বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন তথা ফরয ও নফল ইবাদত-বন্দেগী তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং বস্তু জগতের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক লোভ ও আকর্ষণ যা মানুষের কল্যাণ ও আনুগত্যের বুনিয়াদ –ঐ সমস্ত বুযুর্গের উন্নত ও প্রশংসনীয় চরিত্র এবং দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতি নির্লোভ ও নিস্পৃহ মন-মানসিকতাদৃষ্টে এদের মন থেকে কমে যায়। আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক)দের নফল 'ইবাদত ও ওজীফা পাঠের আধিক্যে এবং বান্দাহসুলভ গুণাবলীর অব্যাহত অনুশীলনে তাদের অন্তরে কাশ্ফ ও কারামত লাভের আরযূ পয়দা হতে থাকে। সে সব মহান বুযুর্গের 'ইবাদত-বন্দেগী ও কার্যকলাপ এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের বরকতের কারণে জনগণের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যেও সততা ও ঈমানদারীর সৃষ্টি হয়। তাঁদের উন্নত চরিত্র, দীনের জন্য কঠোর-কঠিন মুজাহাদা ও রিয়াযত পরিদৃষ্টে আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের মন-মানসে নিজেদের আমল-আখলাকে পরিবর্তনের খাহেশ সৃষ্টি হয় এবং ওই সব দীনী বাদশাহদের মুহব্বত ও আমল-আখলাকের প্রভাবে আল্লাহ তাআলার ফয়েযের বারিধারা দুনিয়ার বুকে বর্ষিত হতে থাকে, আর আসমানী বালা-মুসীবতের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁদের যামানার লোকজন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মুসীবত থেকে রক্ষা পায় এবং তাঁদের একনিষ্ঠ ও ভালবাসামণ্ডিত 'ইবাদত-বন্দেগীর বরকতে মোগলদের ফেতনা বিলুপ্ত হয় এবং তারাও বিনষ্ট হয়ে যাযাবরে পরিণত হয়। ঐ তিনজন বুযুর্গের অস্তিত্বের কারণে সমসাময়িককালে শরীয়ত ও তরীকতের সকল বিধি-বিধানের বিস্ময়কর শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব লাভ ঘটে। কত না আশ্চর্য ছিল সে যুগ যখন সুলতান 'আলাউদ্দীন রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমস্ত নেশা জাতীয় ও নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি এবং পাপাচার ও অন্যায় বিভিন্ন প্রকার কঠোর শাস্তির মাধ্যমে বন্ধ করে দেন। অপর দিকে সে যুগেই শায়খুল ইসলাম নিজামুদ্দীন বায়'আতের'দরজা সাধারণের জন্য খুলে দেন। গুনাহগার ও পাপীদের খিরকা পরিধান করান এবং তাদেরকে তাদের পাপাচার ও অন্যায় থেকে তওবাহ্ করিয়ে মুরীদ বানান। সাধারণ মানুষ, বিশিষ্ট

ব্যক্তিবর্গ, ধনী-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, নিরক্ষর ও শিক্ষিত, আশরাফ-আতরাফ, শহুরে ও গ্রামবাসী, যুদ্ধ বিজয়ী বীর (গাযী) ও মুজাহিদ, স্বাধীন ও গুলাম সবাইকে তাকওয়া ও পাক-পবিত্রতার তা'লীম দেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, সাধারণ মানুষ, চাকর-বাকর সবাই সালাত আদায় করত এবং অধিকাংশ মুরীদ চাশ্‌ত ও সালাতুল ইশরাকেরও পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন ও সৎকর্মশীল লোকেরা শহর থেকে গিয়াছপুর পর্যন্ত কতিপয় অবসর বিনোদন কেন্দ্রে চবুতরা কায়েম করে দিয়েছিল, ছাপ্পড় ফেলে দিয়েছিল, কুয়া খনন করে দিয়েছিল, পানি ভরতি ঘড়া ও মাটির লোটা রেখে দিয়েছিল, দিয়েছিল চাটাই বিছিয়ে। প্রতিটি চবুতরা ও প্রতিটি ছাপড়াতে একজন করে চৌকিদার ও একজন কর্মচারী নিযুক্ত করে দিয়েছিল যেন মুরীদ ও তওবাহকারী সৎলোকেদের শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর আস্তানা পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে, সালাত আদায় করতে কোন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। চবুতরা ও ছাপড়াতে নফল পাঠকারী মুসল্লীদের ভীড় দেখা যেত। অধিকাংশ লোকের মাঝে চাশ্‌ত, ইশরাক, সালাতুল আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ ও বেলা গড়িয়ে যাবার মুহূর্তের নামাযের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব নফল সালাত প্রতিটি ওয়াক্তে কে কত রাকাত আদায় করেছে এবং প্রতি রাকাতে কালামে পাকের কোন্ সূরা এবং কোন্ কোন্ আয়াত পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা হ'ত। অধিকাংশ নতুন মুরীদ শায়খ (র)-এর পুরানো মুরীদদের থেকে গিয়াছপুর যাতায়াতের মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করত, শায়খ (র) রাতের বেলায় কত রাকাত সালাত আদায় করেন এবং প্রতিটি রাকা'তে কি পড়েন, 'ইশার সালাতের পর রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর কতবার দরূদ পাঠান এবং শায়খ ফরীদ (র) ও শায়খ বখতিয়ার কাকী (র) দিন-রাতে কতবার দরূদ পাঠিয়ে থাকেন আর সূরা ইখলাস কতবার পড়েন? নতুন মুরীদরা পুরানো মুরীদদের এবম্বিধ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করত। তারা সিয়াম, নফল এবং কম আহার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করত। পুণ্যের ঐ যুগে অধিকাংশ লোকেরই কুরআন পাক হেফজ করার গভীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। নতুন মুরীদ শায়খ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর পুরানো মুরীদদের সাহচর্যে থাকত। পুরানো মুরীদদের আনুগত্য, 'ইবাদত-বন্দেগী, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি, তাসাওউফের গ্রন্থাদি পাঠ, মাশায়িখে কিরামের প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং তাঁদের কার্যকলাপ তথা পারস্পরিক লেনদেন বর্ণনা করা ব্যতীত আর কোন কাজ ছিল না। দুনিয়া ও দুনিয়াদার লোকদের সম্পর্কে কোন আলোচনা তাদের মুখেই আসত না। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর মেলামেশার কাহিনীর প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না, সেটাকে তারা দূষণীয় ও পাপ বলে মনে করত। নফল 'ইবাদত-বন্দেগীর আধিক্য ও পাবন্দীর ব্যাপারগুলি ঐ বরকতময় যুগে এমত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল যে, বাদশাহী মহলের অনেক আমীর-উমারা, সৈন্যাধ্যক্ষ, শাহী ফৌজ ও নওকর

শায়খ (র)-এর মুরীদ হতেন এবং চাশ্ত ও সালাতু'ল-ইশরাক আদায় করতেন। 'আইয়ামবীয'-এর সিয়াম ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের সিয়ামও পালন করতেন। আর এমন কোন মহল্লাও ছিল না যেখানে এক মাস বিশ দিন পর নেককার লোকদের সম্মেলন হ'ত না কিংবা সূফীদের সামা'র মহফিল হ'ত না এবং তাঁরা পারস্পরিক কান্নাকাটি করতেন না। শায়খ (র)-এর কতিপয় মুরীদ তারাবীহের নামাযে এবং ঘরেও খতমে কুরআন করতেন। যে সমস্ত লোক এ বিষয়ে একটি স্থিতি অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল তারা রমযান মাসে, জুমু'আর দিনে এবং ধর্মীয় আনন্দ উৎসবের রজনীগুলিতে ভোর পর্যন্ত জেগে কাটাত, দুই চোখের পাতা কখনও এক করত না। শায়খ (র)-এর মুরীদদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ স্তরের ছিলেন তাঁরা সারা বছর ধরেই রাত্রির এক বা দুই-তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পাঠে কাটিয়ে দিতেন। কোন কোন 'ইবাদত-গোযার ব্যক্তি 'ইশার সময়কার ওযু দিয়েই ফজর আদায় করতেন। শায়খ (র)-এর মুরীদদের ভেতর থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আমি জানি যে, শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর ফয়েয ও অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভে কাশ্ফ ও কারামতের অধিকারী হয়েছিলেন। শায়খ (র)-এর পবিত্র অস্তিত্ব, তাঁর নিশ্বাসের বরকত এবং তাঁর মকবুল দু'আর কারণে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান 'ইবাদত-বন্দেগী, তাসাওউফ ও যুহ্দ-এর দিকে ঝুঁকে পড়া এবং শায়খ (র) -এর মুরীদ হবার দিকেই অগ্রগামী হয়ে গিয়েছিল। সুলতান 'আলাউদ্দীন গোটা পরিবারসহ শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর একনিষ্ঠ ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবার অন্তরেই সততা ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। 'আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বছরে মদ, প্রেমের দালালী, অন্যায় ও পাপাচার, জুয়া ও অশ্লীলতা ইত্যাদির নামও উচ্চারিত হ'ত না অধিকাংশ লোকের মুখে। বড় গুনাহ্ জনগণের নিকট কুফরীর সমার্থক বলে প্রতীয়মান হ'ত। মুসলমানরা লজ্জাবশত সুদখোরী ও মজুদদারীতে খোলাখুলি লিপ্ত হতে পারত না। দোকানদারদের মধ্যে মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া ও ভেজাল মেশানোর রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্র ও বড় বড় লোক যারা শায়খ (র)-এর খেদমতে থাকত, তাসাওউফ ও তরীকতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়নের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। কূতু'ল-কুলূব, ইয়াহইয়াউল 'উলূম, তরজমা ইয়াহ্ইয়াউল 'উলূম, 'আওয়ারিফ, কাশফুল মাহ্জূব, শরাহ্ তাআররুফ, রিসালা কুশায়রী, মিরসাদুল 'ইবাদ, মাকতুবাতে আয়নুল কুযাত, কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরীর লাওয়ায়েহ ও লাওয়ামেহ এবং ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ-এর বহু ক্রেতা ও পাঠক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ লোক পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে মা'রিফত ও হাকীকত সম্পর্কিত কিতাবাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এমন কোন পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি ছিল না যার

পাগড়ীতে মেসওয়াক ও চিরুণী দৃষ্টিগোচর হ'ত না। সূফী-দরবেশদের অতিরিক্ত ক্রয়ের কারণে লোটা ও চামড়ার পাত্রের অভাব দেখা দিয়েছিল। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) কে অতীত যুগের হযরত শায়খ জুনায়দ বাগদাদ (র) এবং শায়খ বায়েযীদ বিস্তামী (র)-এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি করেই পয়দা করেছিলেন।"[১]

প্রেমের বাজার

তওবাহ্, ঈমানী পুনরুজ্জীবন ও অবস্থার সংস্কার দ্বারা দিল্লীর প্রতিটি অলি-গলি প্রভাবিত হচ্ছিল এবং শাহী দরবার ও শাহী মহলসহ "বামে হাযার সতূন" পর্যন্ত তার ঢেউ গিয়ে পৌছেছিল। একটি নতুন পরিবর্তন এই ছিল যে, মস্তিষ্ক-উদ্ভূত অহংকার ও অতিবিমর্ষতার এই জগতে -যেখানে বাঁশরী ও চিত্তহারী বস্তু ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না- সেখানে ঐশী আবেগ-উদ্দীপনার একটি মলয় সমীরণ প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং প্রেমের সওদার ব্যাপক লেনদেন ঘটে। প্রতিটি স্থানে প্রেমের আলোচনা, হাকীকত ও মারিফতের কথাবার্তা এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারাপূর্ণ ও প্রেম সম্বলিত কবিতাবলী গুঞ্জরিত হতে থাকে। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা আমীর খোরদ কি সুন্দর লিখেছেন ঃ

" মুহব্বত ও ইশকের কারবারের যুগে একটি বাজার লেগেছে। সামা'র কাহিনী , ইখলাস ও আনুগত্য, প্রীতি ও নম্রতা, অন্তরের প্রশান্তি ও প্রেমিকের পায়ের উপর মাথা রেখে দেওয়া ব্যতিরেকে আর কোন কিছুতেই জনসাধারণের শান্তি লাভ ঘটত না।"[২]

খলীফাদের তরবিয়ত

ইরশাদ ও তরবিয়তের এই সিলসিলা এবং 'ইশ্ক ও মুহব্বতের এই তরীকা-পদ্ধতিকে হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্তর এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া এবং বহুদিন পর্যন্ত এই সিলসিলা ও পদ্ধতিকে কায়েম ও বহাল রাখবার জন্য তিনি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ও যোগ্যতার অধিকারী আপাদমস্তক একনিষ্ঠ খলীফাদের গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। তাদের ভেতর সেসব গুণ ও পরিপূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস চালান যেসব কামিল বুযুর্গদের জন্য অপরিহার্য। তাদের দিয়ে মুজাহাদা (আধ্যাত্মিক পথের কঠোর-কঠিন সাধনা) করান, তাদের কলব (আত্মা)-এর

---

১. তারীখে ফীরূযশাহী; যিয়াউদ্দীন বারনীকৃত, ৩৪১-৪৬ পৃ.;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫১০।

দেখাশোনা করেন, তাঁদের মধ্যে যিনি উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং ইল্‌ম-এর অলংকার থেকে ছিলেন মাহরুম, তিনি তাঁদের পরিপূর্ণ 'ইল্‌ম হাসিলের বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের অন্তর থেকে এখন পর্যন্ত বাহাছ-বিতর্কের নেশা কাটে নি, তাঁদের তিনি শুধরে দেন। যাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতে পথ-প্রদর্শন ও সামাজিক জীবনে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখেন, কিন্তু তাদের নির্জনবাস, লোকালয় বর্জন, একক ও নিঃসঙ্গ 'ইবাদত-বন্দেগী ও মুজাহাদায় আগ্রহ ছিল তাদেরকে তিনি সামাজিক জীবন এখতিয়ার করতে ও আল্লাহ্‌র মাখলুকের জুলুম-অত্যচার বরদাশ্‌ত করতে বাধ্য করেন। সংস্কার ও তরবিয়তের যে দুনিয়াব্যাপী কর্মকাণ্ডের নীলনকশা তাঁর সামনে ছিল এবং আপন বিশিস্ট সাথীদের থেকে দীনের দাওয়াত ও তবলীগের যে খেদমত নেবার ছিল সে পথের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব কিছুই তিনি বিদূরিত করেন।

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন আযোধ্যার অধিবাসী, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দোস্ত ও খাদেমবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর নিকট থেকে পঠন-পাঠন ও বাহাছ বিতর্কের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা হবে।

যদিও ঐ সব দোস্তের প্রত্যেকেই প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী 'আলিম ছিলেন এবং সুলতানুল মাশায়িখের সোহবত ও সাহচর্যের ফয়েয ও বরকতে আল্লাহ্‌র স্মরণে ছিলেন নিরন্তর মশগুল, তথাপি যে কর্মে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন তার প্রতি তাঁরা স্বাভাবিকভাবে তখনও কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন। মাওলানা জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে সবাই তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর উপর যিকরে ইলাহীর কারণে এমন এক নূরের তাজাল্লী ছিল যে, লোকেরা তাঁর সামনে কথা বলার সাহস পেত না। এ ব্যাপারে মাওলানা জালালুদ্দীনের সাহসের কিছুটা সুনাম ছিল। তিনি বললেন যে, যদি এজাযত দেন তবে সাথী দোস্তরা কোন সময় বাহাছ-আলোচনা করতে পারে। সুলতানুল মাশায়িখ (র) বুঝতে পারলেন যে, এটা এখানে উপস্থিত সমস্ত 'উলামায়ে কিরামের সম্মিলিত ইচ্ছাও বটে এবং মাওলানা জালালুদ্দীন এদের সবার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি বললেন, আমি কি করব, ওদের দিয়ে অন্য কোন খেদমত নেওয়াই তো আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।[১]

মাওলানা সাইয়্যেদ নাসীরুদ্দীন মাহমূদ যিনি পরে হযরত খাজা (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ও প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং চেরাগে দিল্লী নামেই যিনি সারা দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন কোথাও কোন জঙ্গল অথবা পাহাড়ে গিয়ে যিকরে ইলাহীতে মগ্ন হতে। একদিন তিনি আমীর

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৩০৬

খসরুর মাধ্যমে বলে পাঠান যে, অধম অযোধ্যায় বসবাস করে। লোকজনের ভীড়ে আমার সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যদি এজাযত দেন তবে আমি কোন বিয়াবান ময়দানে কিংবা কোন পাহাড়ে গিয়ে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলামুক্ত হয়ে আল্লাহর্ 'ইবাদত করি। আমীর খসরু যখন এ পয়গাম পৌছালেন তিনি বললেন ঃ

"তাকে বলে দিও, তোমাকে জনসমাজে থাকতে হবে এবং মানুষের অমানবিক ও অমানুষসুলভ আচার-আচরণকে বরদাশ্ত করতে হবে, আর বদান্যতা ও ত্যাগের দ্বারাই এর উত্তর দিতে হবে।"[১]

মাওলানা হুসসামুদ্দীন মুলতানী খেলাফত প্রাপ্তির পর আরয করেছিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে শহর ছেড়ে দেই এবং কোন ঝর্ণাধারার ধারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি। কেননা শহরে যে পানি মেলে তা কূয়ার আর সে পানিতে ওযু করলে অন্তরের প্রশান্তি লাভ ঘটে না।[২] এতে তিনি বলেন: না, তুমি শহরেই থাকবে, থাকবে সাধারণ একজন মানুষের মত। মন চাচ্ছে তোমাকে আরামের জায়গায় নিয়ে যেতে এবং এমন জায়গায় রাখতে যেখানে সামাজিকতার কোন বালাই নেই। যখনই তুমি শহরের বাইরে গিয়ে পড়বে এবং কোন ঝর্ণাধারার কিনারে বসবাস করতে শুরু করবে তখন বিদেশী ও শহুরে লোকজন খুঁজে তোমাকে বের করবে, চারদিকে মশহূর হয়ে পড়বে যে, অমুক জায়গায় অমুক দরবেশ অবস্থান করছেন। ফলে জনসাধারণ তোমার সময় নষ্ট করবে। তাছাড়া কূয়ার পানির ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শরীয়তের দৃষ্টি এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার।

চিশতী খানকাহ্

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাজা (র)-কে অত্যন্ত মর্যাদাবান খলীফা (প্রতিনিধি) দান করেছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকজন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন ঃ

(১) মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া, (২) শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদ, (৩) শায়খ কুত্বুদ্দীন মুনাওয়ার হাঁসভী, (৪) শায়খ হুসসামুদ্দীন মুলতানী, (৫) মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবী, (৬) মাওলানা আলাউদ্দীন নীলী, (৭) মাওলানা বুরহানুদ্দীন গরীব, (৮) মাওলানা ইউসুফ চুন্দিরী, (৯) মাওলানা সিরাজুদ্দীন আখী সিরাজ ও (১০) মাওলানা শিহাবুদ্দীন।

---

১. ঐ. ২৩৭ পৃষ্ঠা;

২. পানি ভর্তিকারীদের অসতর্কতার দরুন এবং কোন কিছু এতে পতিত হবার আশংকায়।

বিশিষ্ট মুরীদবর্গ

(১) খাজা আবুবকর, (২) মাওলানা মুহীউদ্দীন কাশানী (৩) মাওলানা ওয়াজীহুদ্দীন পায়েলী, (৪) মাওলানা ফখরুদ্দীন মরোযী, (৫) মাওলানা ফসীহুদ্দীন, (৬) আমীর খসরু, (৭) মাওলানা জালালুদ্দীন, (৮) খাজা করীমুদ্দীন সমরকন্দী, (৯) হাসান 'আলা সিজযী, (১০) কাযী শরফুদ্দীন, (১১) মাওলানা শিহাবুদ্দীন আদহামী, (১২) শায়খ মুবারক গোপামভী, (১৩) খাজা মুওয়াইদুদ্দীন কারভী, (১৪) খাজা তাজুদ্দীন দাওরী, (১৫) খাজা যিয়াউদ্দীন বার্নী, (১৬) খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন আনসারী, (১৭) খাজা শামসুদ্দীন খাওয়াহিরযাদা, (১৮) মাওলানা নিজামুদ্দীন শিরাজী, (১৯) খাজা সালার, (২০) মাওলানা ফখরুদ্দীন মিরাবী।

এঁদের মধ্যে হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-কে তিনি খাস খেলাফতনামা প্রদান করেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান। তিনি (হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী) ছিলেন তাঁর শায়খ (র)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী। তিনি অত্যন্ত নাযুক ও সঙ্গীন অবস্থাতে এবং কঠিন রাজনৈতিক সংকটেও জনগণের হেদায়তের বাসনায় ইরশাদ ও হেদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল রেখেছিলেন।

ফীরূয তুগলকের সিংহাসনারোহণ এবং এথেকে ভারতবর্ষের যে ফয়েয ও বরকত পৌছেছিল তার ভেতর হযরত সাইয়্যেদ নাসীরুদ্দীন (র)-এরই হাত ছিল।[১] পুরো বত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি চিশতীয়া সিলসিলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা রাজধানী দিল্লীতে বসে অত্যন্ত সাফল্য ও কামিয়াবীর সাথে পরিচালনা করেন। অতঃপর আলোর এই প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত হল যিনি দক্ষিণ ভারতেই শুধু নয় বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে 'ইশ্‌ক ও মুহব্বতের উত্তাপ দিয়ে উত্তপ্ত এবং তাঁর খোশবু দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করে তুলেছিলেন অর্থাৎ হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসূদরায-যিনি গুলবার্গে[২] সমাহিত (ওফাত ৮২৫ হিজরী) আছেন।

হযরত সাইয়্যেদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর অপর খলীফা 'আল্লামা কামালুদ্দীন (ওফাত ৭৫৬ হিজরী) যাঁরা বংশধর ও খলীফাবৃন্দ এই সিলসিলাকে এই শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত জোরেশোরে কায়েম রাখেন। এই সিলসিলায় হযরত ইয়াহইয়া মাদানী, শাহ কলীমুল্লাহ্ জাহানাবাদী, মাওলানা শাহ ফখরুদ্দীন দেহলভী, খাজা নূর মুহাম্মাদ মাহারভী, শাহ নিয়ায আহমাদ বেরেলভী এবং খাজা সুলায়মান তৌনসভীর ন্যায় মহান বুযুর্গ রয়েছেন যাঁরা 'ইশকে ইলাহী তথা ঐশী

---

১. দেখুন তারীখে ফীরূযশাহী, সিরাজ 'আফীফ কৃত;

২. হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মদ গেসূদরাযের জীবন-বৃত্তান্ত ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে হলে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন প্রয়োজন।

প্রেমের বাজার রেখেছিলেন গরম ও উত্তপ্ত এবং যাঁরা আল্লাহ্‌র লাখ লাখ বান্দার অন্তর-মানসকে আল্লাহ্‌র মুহব্বত ও কামনায় ভরপুর করে দিয়েছিলেন।[১]

হযরত চেরাগে দিল্লীর খলীফাদের মধ্যে শায়খ আবদুল মুকতাদির কুন্দী, শায়খ আহমদ থানেশ্বরী এবং শায়খ জালালুদ্দীন হুসায়ন বুখারী–যিনি মখদূম জাহানিয়া জাহাঁগাশ্‌ত নামে পরিচিত, বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের বুযুর্গ এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের লক্ষ্যস্থল ছিলেন।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় খানকাহ্‌র পর যেখানে দা'ওয়াত ও হেদায়াতের মসনদে ধারাবাহিকভাবে পর পর হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) ও হযরত সাইয়্যেদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর ন্যায় মহান দুই বুযুর্গ সমাসীন ছিলেন–ভারতবর্ষের পাণ্ডুয়া, লখনৌতি, দৌলতাবাদ, গুলবর্গা, বুরহানপুর, যয়েনাবাদ, মাণ্ডো, আহমাদাবাদ, সফীপুর, মানিকপুর, সলোন নামক বিভিন্ন জায়গায় চিশতীয়া খানকাহ কায়েম হয় যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত করার ন্যায় দাওয়াত ও তবলীগের সিলসিলা কায়েম রাখেন এবং 'ইশ্‌ক ও মুহব্বত, সততা ও ইখলাস, উচ্চ মনোবল ও অটুট সংকল্প খেদমতে খাল্‌ক তথা সৃষ্টির সেবা, কুরবানী ও আত্মত্যাগ, বদান্যতা ও দানশীলতা, দারিদ্র ও যুহ্‌দ, 'ইল্‌ম ও মা'রিফতের প্রদীপ আলোকিত রাখেন। এসবের মধ্যে প্রতিটি খানকাহ এবং তার ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক কার্যাবলীর জন্য একটি বিরা পুস্তকের দরকার॥ বিশেষ করে বাংলাদেশে শায়খ 'আলাউল হক পাণ্ডবী,[২] হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলম পাণ্ডবী[৩] দাক্ষিণাত্যে শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব, তাঁর খলীফাদের মধ্যে

---

১. এসব বুযুর্গের বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত জানতে হলে দেখুন, "তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত"- অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামীকৃত।

২. শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলাউল হক পাণ্ডবীর আসল নাম ওমর। পিতা আস'আদ লাহোরী বাংলার উযীর পদে সমাসীন ছিলেন। শায়খ 'আলাউল হক হযরত মাহ্‌বুবে ইলাহীর মুশহূর খলীফা মাওলানা সিরাজুদ্দীন 'উছমানী আউধী–যিনি আখী সিরাজ নামে পরিচিত (ওফাত ৭৫৮ হিজরী)-এর খলীফা এবং পাণ্ডুয়ার মশহূর 'আলিম ও চিশতী খানকাহর প্রতিষ্ঠাতা। সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (ওফাত ৮০৮ হিজরী) তাঁরই খলীফা। ৮০০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. নাম নূরুদ্দীন, উপাধি নূরুল হক ও কুতবে 'আলম; পিতা শায়খ 'আলাউল হক পাণ্ডবীর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। তাঁর যুগে পাণ্ডুয়ার খানকাহ ছিল তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিশতী খানকাহ। মুজাহাদা, খেদমতে খালক, বস্তুগত স্বার্থের প্রতি নিস্পৃহতা ও আত্মোৎসর্গ এবং 'ইলমে হাকীকতে অত্যন্ত উচ্চ মরতবার অধিকারী ছিলেন। খলীফার ভেতর হযরত শায়খ হুসসামুদ্দীন হুসামুল হক মানিকপুরী (ওফাত ৮৫৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– যাঁদের পবিত্র সত্তার প্রভাবে বিহার ও অযোধ্যায় চিশতীয়া নিজামিয়া সিলসিলার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। ৮১৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কিতাবাদির মধ্যে "মুনিসুল ফুকারা','আনিসুল গুরাবা',' মাকাতীব কা মাজমু'আ' স্মরণীয়। মালফুজাত ও মাকতুবাতে গজবের সরলতা ও প্রভাব বিদ্যমান (নুযহাতুল খাওয়াতির, ৩য় জিলদ দ্র.)।

শায়খ যয়নুদ্দীন, শায়খ ইয়াকূব, শায়খ কামালুদ্দীন নাগোরী ফিতানী, অতঃপর তাঁর খলীফা কুত্বে 'আলম 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাহমূদ ইবন আল-হুসায়ন (ওফাত ৮৫৭ হিজরী) এবং তাঁর ফরযন্দ ও খলীফা শাহ 'আলম গুজরাটি চাটাই-এর আসনে বসে নিজ নিজ যুগে রাজত্ব করেছেন।

মলোয়ায় শায়খ ওয়াহীদুদ্দীন ইউসুফ, শায়খ কামালুদ্দীন, মাওলানা মুগীছুদ্দীন প্রমুখ, অযোধ্যায় হযরত শায়খ মুহাম্মদ মীনা লাখনবী, শায়খ সা'দুদ্দীন কিদওয়াই খায়রাবাদী, শায়খ 'আবদুস সামাদ ওরফে সফীউদ্দীন সফীপুরী, শায়খ হুসসামুল হক মানিকপুরী, শায়খ 'আবদুল করীম মানিকপুরী এবং শাহ পীর মুহাম্মদ সলোনী ও শাহ্ পীর মুহাম্মাদ লাখনবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই নিজামিয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ যাঁরা স্ব-স্ব স্থানে হেদায়াত ও তবলীগ এবং তা'লীম ও তরবিয়তের সিলসিলা অত্যন্ত জোরেশোরেই অব্যাহত রেখেছিলেন। এঁদের থেকে ফয়েযপ্রাপ্তদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কেউ বলতে পারবে না।

এসব খালেস চিশতী খানকাহ্ ব্যতিরেকেও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এমন সব নামকরা খানকাহ্ও কায়েম ছিল যার মহান বুযুর্গ ও সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতাদের সিলসিলায়ে নিজামিয়ার চিশতী বুযুর্গদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং যাঁরা চিশতীয়া তরীকার ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ও সম্পৃক্ততার অধিকারী ছিলেন। এর ভেতর জৌনপুরের খানকায়ে রশীদী এবং ফুলওয়ারী শরীফের খানকায়ে মুজীবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খানকায়ে রশীদীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত 'আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ জৌনপুরী (ওফাত ১০৮৩ হিজরী)-এর শায়খ তৈয়ব বেনারসী এবং সাইয়্যেদ আহমাদুল হালীম হুসায়নী মানিকপুরী থেকে চিশতীয়া নিজামিয়া সিলসিলার এজাযত হাসিল করেছিলেন। খানকায়ে মুজীবীর প্রতিষ্ঠাতা তাজুল 'আরিফীন হযরত শাহ মুহাম্মাদ মুজীবুল্লাহ্ কাদিরী ফুলওয়ারীর (ওফাত ১১৯১ হিজরী) সিলসিলায়ে চিশতীয়া নিজামিয়া স্বীয় পীর হযরত খাজা 'ইমাদুদ্দীন কলন্দর এবং হযরত শাহ মু'ঈনুদ্দীন কারজুবীর মাধ্যমে পৌঁছেছিল। শাহ মু'ঈনুদ্দীন কারজুবী হযরত শায়খ পীর মুহাম্মাদ সলোনীর খলীফা ছিলেন।

পরিশেষে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)-এর পবিত্র সত্তা নিজামিয়া ও সাবিরিয়া সিলসিলার বৈশিষ্ট্য ও বরকতের সমষ্টি ছিল। হযরত হাজী সাহেব নিজামিয়া সিলসিলার নিসবত হযরত শায়খ 'আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন, যিনি অযোধ্যার হযরত দরবেশ ইবন মুহাম্মদ ইবন কাসিম থেকে নিজামিয়া সিলসিলার এজাযত লাভ করেছিলেন। হযরত দরবেশ তিন সূত্র থেকে নিজামিয়া সিলসিলা পেয়েছিলেন।

১. দেখুন "তাযকিরাতুর রাশীদ," ৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

হযরত খাজা (র)-এর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাব এবং তাঁর খলীফাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক খেদমত

হযরত সুলতানুল মাশায়িখ স্বীয় খলীফা ও মুরীদদের অত্যন্ত যত্ন, তদবীর ও অভিনিবেশ সহকারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারের আমীর-উমারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন ছিলেন একজন উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি। হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্ক দিনে দিনে এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর মন-মিযাজ রাজদরবারের প্রতি বিরূপ ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে এবং হযরত খাজা (র)-এর খেদমতেই এসে অবস্থান করতে শুরু করেন। সুলতান তাঁর যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতায় ছিলেন মুগ্ধ এবং তিনি তাঁর প্রয়োজন অহরহ অনুভব করতেন। একদা সুলতান তাঁর জনৈক পাহারাদারের মাধ্যমে হযরত খাজা(র)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন এবং বলেন যে, হযরত সবাইকেই তাঁর নিজের মত বানাতে চান। হযরত খাজা (র) এর জবাবে বলেছিলেন, নিজের মত কী ! আমার চেয়েও উত্তমই বানাতে চাই।

হযরত খাজা (র)-এর সোহবত (সাহচর্য ও সংসর্গ) ও তরবিয়ত দ্বারা শুধুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদার গভীর আগ্রহ এবং নিজের সংস্কার-শুদ্ধি ও উন্নত চিন্তাই সৃষ্টি হ'ত না, দাওয়াত ও তবলীগের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা, "আমরু বি'ল-মা'রুফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার" তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে হিম্মত ও উচ্চ মনোবল, তৎকালীন সুলতানদের সামনে কালেমায়ে হক তথা হক-কথা বলার সাহসিকতা ও নির্ভীকতাও সৃষ্টি হত। এটা ছিল আল্লাহ্র নাম এবং আল্লাহ্র বান্দাদের সাহচর্যের আনিবার্য সুফল। যে অন্তরে একবার আল্লাহ্র ভয় অনুপ্রবিষ্ট হবে তার অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ্র ভয় স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নেবে এবং যে অন্তর দুনিয়ার প্রতি

লোভ-লালসা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন, তার উপর কারও ভীতি যেমন কার্যকর হয় না, তেমনি তারও কাউকে ভয় পাবার কোন কারণ থাকে না। যার যামনে স্রষ্টার মহান মর্যাদা এবং সৃষ্টিজগতের যথার্থ অবস্থান ও স্থান প্রকাশিত হয়ে গেছে সে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌দের শান-শওকত, তাঁদের দরবারের জাঁকজমক, তাঁদের গুলাম-নফর ও রাজকর্মচারীদের কাতারবন্দী, সম্মুখ দৃষ্টি ও হাঁক-ডাক বাচ্চাদের খেলাধুলা ও ভাঙাগড়ার মিছামিছি কৌতুকের বেশি এতটুকু গুরুত্ব দেয় না এবং জাঁকজমকপূর্ণ কোনো প্রদর্শনীর স্থলে সত্য কথনে ও হক-কথা উচ্চারণে তাদেরকে কখনও বিরত রাখতে পারে না। এটাই তাওহীদবাদিতা ও নির্জনতার স্বাভাবিক পরিণতি, প্রকৃত তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্‌র বান্দা ও কামিল দরবেশের রীতি।

হযরত খাজা (র)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খাদেম ও মুরীদবৃন্দ ঐশী প্রেম, সত্য কথন ও নির্ভীকতার এমন নমুনা পেশ করে গেছেন যার নজীর মেলা খুবই কঠিন।

তৎকালীন সুলতানদের সঙ্গে নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার নমুনা

সুলতান মুহাম্মদ তুগলকের শান-শওকত ও জাঁকজমক সম্পর্কে ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই অবহিত। সুলতানকে একবার হাঁসির নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। সেখান থেকে চার ক্রোশ দুরে অবস্থিত বংশী নামক স্থানে শাহী তাঁবু স্থাপিত হয়। সুলতান মুখলেসুল মুল্‌ক নিজামুদ্দীন মুজিরবারীকে,–জুলুম-যবরদস্তি, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য যে ছিল বিখ্যাত,–সে সময় হাঁসির কেল্লা পরিদর্শনের জন্য পাঠান। সে যখন হযরত শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ার (হযরত শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসোভীর পৌত্র এবং হযরত সুলতানুল মাশায়িখের খলীফা)-এর বাড়ির নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন জিজ্ঞাসা করে যে, এ বাড়িটা কার? লোকজন বলল, এটা সুলতানুল মাশায়িখের খলীফা শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ারের বাড়ি। এতে সে বলল, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, বাদশাহ্‌ এতদঞ্চলে পদার্পণ করেছেন অথচ শায়খজী তাঁকে সালাম করবার জন্য একবারও হাযির হলেন না। মুখলেসুল মুল্‌ক বাদশাহ্‌র নিকট ফিরে গিয়ে সব কিছু বিবৃত করল এবং এও বলল যে, হাঁসিতে সুলতানুল মাশায়িখের একজন খলীফা আছেন যিনি জাহাঁপনাকে সালাম দিতে হাযির হন নাই। বাদশাহ্‌ একথা শুনে রেগে যান এবং তক্ষুণি হাসান সার বুরহানাকে –যে ছিল একজন অহংকারী ও জাঁকজমকপ্রিয় লোক-- শায়খ কুত্‌বুদ্দীনকে আনবার জন্য পাঠান। হাসান সার বুরহানা বাড়ির নিকটে গিয়ে একাকী পায়ে হেঁটে শায়খজীর দহলিজে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে উপবেশন করেন। শায়খজী তাঁকে ডেকে পাঠান। হাসান সার

বুরহানা গিয়ে আরয করলেন যে, বাদশাহ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, এতে কি আমার কোন এখতিয়ার আছে? হাসান বললেন, আমার উপর বাদশাহী হুকুম, যে কোনভাবেই হোক না কেন, আমি যেন আপনাকে নিয়ে যাই। শায়খ বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ! আমি নিজের এখতিয়ারে যাচ্ছি না। অতঃপর গৃহবাসীদের উদ্দেশ করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করলাম", এই বলেই মুসাল্লা কাঁধের উপর ফেলে এবং লাঠি হাতে পদব্রজেই রওয়ানা হয়ে পড়লেন। হাসান সার বুরহানা সওয়ারির কথা বলতেই তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমার শক্তি আছে, আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারি। বংশী পৌঁছুতে সুলতান খবর পেলেন এবং শায়খকে দিল্লী যাবার নির্দেশ দিলেন। দিল্লী পৌঁছে তিনি তাঁকে শাহী দরবারে ডেকে পাঠালেন। শায়খ তৎকালীন নায়েবে বারবাক ফীরূয শাহকে বললেন যে, আমরা ফকীর মানুষ, শাহী দরবারের আদব-কায়দা সম্পর্কে কিছু জানি না। আপনি যেভাবে পরামর্শ দেবেন সেভাবেই তা পালিত হবে। ফীরূয শাহ ছিলেন বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী ও ফকীর-প্রিয় মানুষ। তিনি বললেন যে, লোকে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই বাদশাহ্র কানে লাগিয়েছে। আপনি যদি কিছুটা বিনয় ও তা'জীমের সাথে কাজ করেন তবে উত্তম হবে। তিনি শাহী মহলের দহলিজে পা রাখতেই রাজ্যের আমীর-উমারা, ঘোষক (নকীব) সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। সাহেবযাদা নূরুদ্দীন হাঁসি থেকে একই সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল কম এবং তিনি ইতোপূর্বে রাজা-বাদশাহদের দরবার দেখেন নি বিধায় ভীত হয়ে পড়েন। শায়খ কুতবুদ্দীন মুনাওয়ার তাকে ডেকে বললেন, বাবা নূরুদ্দীন! العظمة والكبريا ءلله "শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ্র জন্য।" সাহেবযাদা নূরুদ্দীন বলেন যে, একথা শুনতেই আমার ভেতরে একটি শক্তির সঞ্চার হল ও সমস্ত ভয়-ভীতি দূর হতে লাগল। রাজ্যের যে সমস্ত আমীর-উমারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা আমার নিকট একদম বকরীবৎ মনে হতে লাগল। সুলতান যখন জানতে পারলেন যে, শায়খজী আসছেন তখনই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তীর-ধনুক হাতে নিয়ে তীরন্দাযীতে মশগুল হয়ে পড়লেন। শায়খ নিকটে আসতেই স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ তাঁকে তা'জীম ও মুসাফাহা করলেন। শায়খ অত্যন্ত শক্তভাবে বাদশাহ্র হাত আঁকড়ে ধরেন। বাদশাহ্ বলেন যে, আমি আপনার এলাকায় গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে অভ্যর্থনাও জানাননি, এমনকি আমার সাথে সাক্ষাতও করেননি। শায়খজী বললেন যে, এ দরবেশ নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করে না যে, বাদশাহ্র সঙ্গে মুলাকাত করবে। এক কোণে পড়ে বাদশাহ ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য দু'আ-খায়রে মশগুল আছি। অক্ষম মনে করে রেহাই দিলে খুশী হই। বাদশাহ এতে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং আপন ভ্রাতা ফীরূয শাহকে বলেন, শায়খজীর যেমনটি মর্জি তেমনটিই কর। শায়খ মুনাওয়ার বললেন,

বাপ-দাদার ভিটে-মাটিতে গিয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে পারাটাই আমার মত ফকীরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ফীরূয শাহ্ এ আকাংক্ষা তৎক্ষণাৎ পূরণ করলেন। শায়খজীর প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ্ একজন আমীরকে বলেন যে, যে সমস্ত বুযুর্গের সঙ্গে মুসাফাহা করার সুযোগ আমার হয়েছে তাদের মধ্যে যারাই আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাদের হাতে আমি কাঁপুনি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শায়খ মুনাওয়ার এতখানি শক্তভাবে মুসাফাহা করেন যে, তার উপর আমার কোনো প্রভাব পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বাদশাহ্ ফীরূয শাহ্ এবং মাওলানা যিয়াউদ্দীন বার্নীকে তৎকালীন এক লাখ তংকা[১] সমেত শেখ মুনাওয়ারের খেদমতে পাঠান। (তংকা দর্শনে) শায়খ বলেন, এই দরবেশ এক লাখ তংকা গ্রহণ থেকে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। প্রেরিত শাহী প্রতিনিধিদ্বয় ফিরে এসে সুলতানকে সব কিছু অবহিত করেন। সুলতান বললেন, এক লাখ যদি কবুল না করেন তবে পঞ্চাশ হাযারই তাঁর খেদমতে পেশ কর। কিন্তু শায়খ তাও কবুল করলেন না। সুলতান এতে বললেন, যদি শায়খ এটাও কবুল না করেন তবে লোকে আমাকে কি বলবে। শেষ পর্যন্ত তংকার অংক দু'হাযারে এসে দাঁড়ায়। ফীরূয শাহ্ ও মাওলানা যিয়াউদ্দীন শেষাবধি আরয করলেন যে, এর কম অংকের কথা আমরা বাদশাহ্র সামনে কিছুতেই আলোচনা করতে পারি না। শায়খ বলেন, সুবহানাল্লাহ্! দরবেশের তো দু'সের চাল-ডাল এবং এক রত্তি ঘি-ই যথেষ্ট। সে এই হাযার হাযার তংকা দিয়ে কি করবে? অবশেষে অনেক চেষ্টা-তদবীর ও তালবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই কথা বলে যে, শাহী উপহার গ্রহণে একেবারে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে বাদশাহ্ নিজেকে অসন্তুষ্ট ও অপমানিত বোধ করবেন, তাঁকে মাত্র দু'হাযার তংকা গ্রহণ করতে রাযী করানো হয় এবং তিনি সে তংকা আধ্যাত্মিক পথের সাধকবৃন্দ ও অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে হাঁসি ফিরে যান।[২]

যে সময় সুলতান মুহাম্মদ তুগলক দিল্লীর অধিবাসীদেরকে দেবগীরে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন তখন তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি তুর্কিস্তান ও খুরাসানকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করবেন এবং চেঙ্গীয খানের বংশধরদের ভিত্তি উপড়ে দেবেন। সে সময়েই হুকুম হয় যে, দিল্লী ও তৎসন্নিহিত এলাকার জনসাধারণ শ্রেণী-নির্বিশেষে যেন হাযির হয়, বড় বড় তাঁবু সংস্থাপিত হয়, ঐ সমস্ত তাঁবুতে মিম্বর স্থাপন করা হয় এবং উক্ত মিম্বরে উঠে শ্রদ্ধেয় 'উলামাবৃন্দ

---

১. তংকা বা তঙ্গা ছিল সে যুগের ভারতবর্ষীয় মুদ্রা। এতে এক তোলা রৌপ্য থাকত। তুর্কী শব্দ যার অর্থ সাদা শুভ্র অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ২৫৩-৩৫৫ পৃষ্ঠা;

যেন ভাষণ দেন ও জিহাদে উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ দিন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খাস খলীফা মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবী, মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া এবং শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদকে ডেকে পাঠানো হয়। শায়খ কুতবুদ্দীন দবীর ছিলেন হযরত সুলতানুল মাশায়িখের একজন দৃঢ় বিশ্বাসী ভক্ত মুরীদ এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবীর শাগরিদ। মাওলানা ফখরুদ্দীনকে সর্বাগ্রে শাহী দরবারের আনা হয়। সুলতানের সঙ্গে মুলাকাতে মাওলানা অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কয়েক বারই তিনি বলেন যে, আমি আমার মাথাকে ঐ ব্যক্তির দরবারে কর্তিত ও পতিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি হক-কথা বলতে বিরত হব না যেমন, তেমনি এ লোকও আমাকে মা'ফ করবে না। মাওলানা যখন শাহী দরবারে প্রবেশ করেন তখন শায়খ কুতবুদ্দীন দবীর মাওলানার জুতা উঠিয়ে নেন এবং খাদেমের ন্যায় বগলে চেপে দাঁড়িয়ে পড়েন। সুলতান এতে কিছু বলেন না এবং মাওলানা ফখরুদ্দীনের সঙ্গে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়েন। সুলতান বলেন, আমার ধারণা যে, আমি চেঙ্গীয খানের বংশধরদের সমূলে উৎপাটন করি। আপনারা কি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা দেবেন? মাওলানা জবাবে 'ইনশাল্লাহ' বলেন অর্থাৎ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবেই সহযোগিতা করতে পারি। সুলতান বললেন, এটা তো সন্দেহমূলক কথা। মাওলানা বললেন, ভবিষ্যত সংক্রান্ত ব্যাপারে এমনটিই বলা হয়ে থাকে। সুলতান এ কথা শুনে হোচট খেলেন এবং বললেন, আমাকে কিছু নসীহত করুন। মাওলানা বললেন, ক্রোধ দমন করুন। সুলতান বললেন, কোন ধরনের ক্রোধ? মাওলানা বললেন, হিংস্র প্রাণীর ক্রোধ। এবার সুলতান এতখানি ক্রোধান্বিত হন যে, তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু এর বাহ্যিক প্রকাশ থেকে তিনি বিরত থাকেন। এরপর সুলতান খাবার নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। খাবার আনা হল। সুলতান এবং মাওলানা দু'জনেই একই পাত্রে খাচ্ছিলেন। মাওলানা এত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন যেন মনে হচ্ছিল যে, তিনি সুলতানের সঙ্গে একই পাত্রে খাবার গ্রহণ পসন্দ করছেন না। সুলতান অধিকতর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের নিমিত্তে হাড়ি থেকে গোশত আলাদা করে করে মাওলানার সামনে রাখছিলেন আর মাওলানা অত্যন্ত বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে অল্প-স্বল্প খাচ্ছিলেন। অতঃপর দস্তরখান বিস্তৃত করা হয় এবং সুলতান মাওলানাকে বিদায় দেন। বিদায় মুহূর্তে একটি পশমী পোশাক ও টাকার থলে পেশ করেন, কিন্তু মাওলানার হাতে এ সব খেলাত ও টাকার থলি আসবার আগেই শায়খ কুতবুদ্দীন দবীর (র)[১] হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেন। মাওলানা বিদায় হবার পর সুলতান শায়খ কুতবুদ্দীন দবীরকে বলেন, ওহে ধোকাবাজ!

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২৭ ও ২৭৩ পৃষ্ঠা;

তুমি এসব কি করলে? প্রথমে ফখরুদ্দীনের জুতা নিজের বগলে নিলে, অতঃপর তাঁর খেলাত ও টাকার থলিও নিজে সামলে নিলে এবং তাকে আমার তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে, আর সে বিপদ নিজের মাথায় বরণ করে নিলে? শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীর বললেন যে, মাওলানা ফখরুদ্দীন আমার উস্তাদ এবং আমার মুরশিদের খলীফাও বটেন। আমার জন্য এটাই সমীচীন ছিল যে, তাঁর জুতা শ্রদ্ধাভরে আমি মাথায় তুলে নিই– বগলে নেয়া তো অত্যন্ত ছোট ব্যাপার। আর এসব খেলাত ও টাকার থলের এমন কিইবা গুরুত্ব! সুলতান বললেন, এসব কুফরী 'আকীদা ছেড়ে দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে কতল করব। শেষে যখনই মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবী (র)-এর আলোচনা সুলতানের দরবারে উঠত তখনই সুলতান হাত কচলিয়ে বলতেন, আফসোস! ফখরুদ্দীন আমার রক্তলোলুপ তলোয়ারের হাত থেকে বেঁচে গেল।

ইসলামী সালতানাতের পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধান

চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গগণ যদিও যুগের সুলতান-বাদশাহ্‌দের সংস্রব বর্জন ও শাহী দরবার থেকে দূরত্বে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এটাকেই নিজের ও নিজেদের গোটা সিলসিলার চিরন্তন উসূল তথা মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই যুগের সুলতান ও বাদশাহ্‌দের সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনে নির্বাচন, মনোনয়ন কিংবা নিজের রূহানী প্রভাব ব্যবহার করবার মওকা মিলত তখনই তাঁরা এই সুবর্ণ সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের কয়েকজন শাসক এবং প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলির কয়েকজন প্রশাসক চিশতীয়া সিলসিলার এসব বুযুর্গের সঙ্গে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক রাখতেন। এই সম্পর্ক থেকে অনেক অনাসৃষ্টি ও ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং অনেক নিষিদ্ধ ও অনাচারমূলক কার্যকলাপের মূলোৎপাটনসহ বহু আহ্‌কামে শরীয়তের প্রচলন ঘটে।

ভারতবর্ষের সুলতানদের মধ্যে সুলতান ফীরূয শাহ্ তুগলক স্বীয় উত্তম চরিত্র, প্রজাবাৎসল্য, দয়া প্রদর্শন, শান্তিপ্রিয়তা, জনকল্যাণ, জুলুম-অত্যাচারের মূলোৎপাটন, ইসলাম প্রচারের আগ্রহ, মাদরাসা কায়েম ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন সম্ভবত অপর কোন শাসকই তেমনটি ছিলেন না। 'সিরাজে আফীফ' এবং 'তারীখে ফীরূযশাহী'তে এই বাদশাহ্‌র গঠনমূলক কার্যাবলী এবং সে যুগের কল্যাণ ও বরকত, শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

তারীখে ফিরিশতার লেখক লিখেছেন ঃ

"তিনি একজন মহান, ন্যায়বিচারক, ভদ্র, দয়ালু, পরোপকারী ও ধৈর্যশীল বাদশাহ ছিলেন। প্রজাবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনী সবাই তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল। তাঁর শাসনামলে কেউ জুলুম করতে সাহস পেত না।"[১]

লেখক তাঁর শাসননীতির তিনটি বড় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) তিনি কোন মুসলমান কিংবা কোন যিম্মীকে বন্দী করেননি অথবা শাস্তি দেন নি। পুরস্কার ও বিভিন্ন প্রকার উপহার-উপঢৌকন প্রদান এবং এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে তিনি জনগণের আত্মিক প্রশান্তি প্রদান করায় কাউকে বন্দী করার কিংবা শাস্তি দেবার দরকার হয় নি।

(২) খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি যা কিছুই প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করা হ'ত তা তাদের সাধ্য অনুযায়ী আদায় করা হ'ত। অতীত সুলতানগণ যে সব অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করার নিয়ম চালু করেছিলেন সে সব তিনি মওকুফ করে দেন। প্রজাদের সম্পর্কে অশান্তি উৎপাদনকারী এবং ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন অভিযোগই তিনি কানে তোলেন নি, বরং তাঁর বদৌলতে দেশের জনগণ ও প্রজাবৃন্দ অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে ও খোশহালে ছিল।[২]

(৩) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে এবং প্রদেশগুলির শাসন কর্তৃত্বে তিনি দীনদার ও আল্লাহভীরু লোকদের নিযুক্ত করেন। যারা ছিল অশান্তি উৎপাদনকারী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী অসৎ প্রকৃতির, সুলতান তাদের কোন পদই দেননি। কেননা তিনি জানতেন الناس على دين ملوكهم অর্থাৎ জনগণ তাদের রাজা-বাদশাহদের অনুসৃত নীতি-নিয়মেরই অনুসারী হয়ে থাকে।[৩]

কিন্তু অনেক লোকই জানে না যে, ফীরূয শাহ তুগলকের সিংহাসনারোহণ ও তাঁর মনোনয়নের পেছনে হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর বিশেষ হাত এবং তাঁর কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের মুলে তাঁর দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ্‌র ভূমিকা ছিল অনেক বেশী। সিরাজে 'আফীফ-এ বর্ণিত আছে ঃ

"সুলতান মুহাম্মদ তুগলক ঠাঠ মালিক তুগার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যখন গমন করেছিলেন, তখন তিনি হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীনকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সুলতানের ইন্তিকাল হ'লে এবং সুলতান ফীরূযশাহ শাহী তখতে উপবেশন করলে হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন ফীরূযশাহকে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের সঙ্গে ইনসাফ ও সুবিচার করবে, নাকি আমি এসব গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অপর কোন শাসনকর্তা চাইব? সুলতান ফীরূয জবাব দিয়েছিলেন যে,

---

১. তারীখে ফিরিশতা (১ম খণ্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা);

২. শাস্তি দানের যে সব নতুন নতুন তরীকা যা পূর্বতন সুলতানগণ আবিষ্কার করেছিলেন।

৩. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা;

بابندگان خدائے تعالی حلم و رزم و اتفاق کنم

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার, ধৈর্যশীলতা ও ঐক্যের জন্য কাজ করব। হযরত শায়খ এ উত্তর শোনার পর বলে পাঠিয়েছিলেন যে, যদি তুমি আল্লাহ্‌র মাখলুকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর তবে আমি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে তোমার জন্য চল্লিশ বছর চেয়ে নিয়েছি (অর্থাৎ তুমি চল্লিশ বছর রাজত্ব করতে পারবে)। আর প্রকৃত ঘটনাও এই যে, সুলতান ফীরূয শাহ চল্লিশ বছরই রাজত্ব করেছিলেন।"[১]

সুলতান মুহাম্মদ শাহ বাহমনী (৭৫৯-৭৭৬) কে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বুযুর্গই বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়'আতও করেছিলেন। কিন্তু হযরত শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব (র)-এর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খ যয়নুদ্দীন (ওফাত ৮০১ হিজরী) এই ভিত্তিতে বায়'আত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, বাদশাহ মদ্যপান ও শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত। তিনি বলেছিলেন

"আল্লাহর সৃষ্টি জগতের উপর হুকুমত করার যোগ্য ও অধিকারী একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামী বিধি-বিধান তথা এর নিদর্শনাবলীর হেফাজত করার চেষ্টা করবেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কোন অবস্থাতেই শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীর ধারে কাছেও যাবেন না।"

৭৬৭ হিজরীতে সুলতান যখন দৌলতাবাদে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন তখন তিনি হযরত শায়খকে পয়গাম পাঠান যে, হয় আপনি আমার দরবারে হাযির হবেন অথবা নিজ হাতে আমার খেলাফতের বায়'আত লিখে পাঠিয়ে দেবেন। শায়খ এর জবাবে বলেন যে, একবার কোন এক উপলক্ষে একজন 'আলিম, একজন সাইয়্যেদ ও একজন হিজড়া (নপুংসক) কাফিরদের হাতে বন্দী হয়। অতঃপর তারা এদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এদের তিনজনকেই পূজার ঘরে নেওয়া হবে। যে মূর্তিকে সিজদা করবে তার জীবন বাঁচবে আর যে তা করতে অস্বীকার করবে তাকে হত্যা করা হবে। প্রথম 'আলিমকে নেওয়া হল। তিনি কুরআনুল করীমের অব্যাহতির বিধানের[২] উপর আমল করেন এবং মূর্তির সামনে মাথা নুইয়ে নিজের জান বাঁচিয়ে নেন। সাইয়্যেদ সাহেব 'আলিমকে অনুসরণ করেন। এর পর যখন হিজড়ার পালা আসল তখন সে বলল, আমার সারাটা জীবনই তো কেটে গেছে অশালীন কর্মের ভেতর দিয়ে। তাছাড়া

---

১. তারীখে ফীরুযশাহী, পৃঃ. ২৮;

২. إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের (কাফিরদের) নিকট থেকে কোন ভয় বা আশংকা কর তবে তোমরা তাদের সম্বন্ধেসতর্কতার সাথে সাবধানে থাকবে। আল-ইমরান, ৩য় রুকু;

আমি 'আলিমও নই, সাইয়্যেদও নই যে, এগুলোর কোন একটি মর্যাদা ও ফযীলতের দোহাই দিয়ে এমন কাজ করতে পারি। সে নিহত হওয়াটাকেই নিজের জন্য মঞ্জুর করে নিল এবং মূর্তিকে সিজদা করল না। আমার ইচ্ছাও উক্ত হিজড়ার কাহিনীরই অনুরূপ। আমি তোমাদের সব রকমের জুলুম বরদাশ্ত করব, কিন্তু তোমাদের দরবারে হাযির হব না, আর তোমার হাতে বায়'আতও করব না। একথা জেনে বাদশাহ্ তো রেগে আগুন। তিনি তক্ষুণি তাঁকে শহর পরিত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। শায়খও নির্দ্বিধায় স্বীয় মুসাল্লা কাঁধে ফেলে সোজা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র)-এর কবরগাহে গিয়ে তাঁর কবরের শিয়রের দিকে নিজের লাঠি পুঁতে দিলেন এবং মুসাল্লা বিছিয়ে তার উপর বসে পড়লেন। বললেন যে, এখন কেউ যদি বাপের বেটা হও তবে আমাকে এ জায়গা থেকে উঠাও। বাদশাহ্ শায়খ-এর এ ধরনের শক্ত মনোভাব ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করে লজ্জিত হলেন এবং নিজ হাতে নিম্নোক্ত চরণ দু'টি কাগজে লিখে সদর শরীফের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ঃ

من زاں توام توزاں من باش

শায়খ বললেন যে, যদি সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ গাযী শরীয়তের রীতি-নীতির হেফাজত ও প্রচলনের প্রয়াস চালান এবং বিজিত এলাকা থেকে সকল পানশালা এক্ষুণি উঠিয়ে দেন, নিজের পিতার সুন্নতের উপর আমল করেন এবং লোকের সামনে শরাব পান না করেন–কাযী, 'উলামা ও প্রধানদের নির্দেশ দেন যে, তারা 'আমরু বি'ল-মা'রুফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ'-এর ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালাবে তা হলে ফকীর যয়নুদ্দীন থেকে সুলতানের বড় দোস্ত ও কল্যাণকামী অপর কেউ হবে না। অতঃপর নিম্নোক্ত কবিতাটি নিজের কলম দিয়ে নিজ হাতেই লিখে দেন ঃ

تامن بزیم بجز نکوئی نه کنم

جزینك دلی ونیك خوئی نه کنم

أنها که بجائے ما بدیها کردند

تادست رسد بجز نکوئی نه کنم

অর্থাৎ "যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমার দ্বারা ভাল, সদয়, উত্তম ব্যবহার ও আচরণ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পাবে না। যে সমস্ত লোক আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছে, যখনই সুযোগ মিলবে আমি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করব।"

সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ তাঁর নামের সঙ্গে 'গাযী' সম্বোধন দেখে অত্যন্ত খুশী হন এবং ফরমান জারি করেন যে, শাহী উপাধির সঙ্গে এটা যেন অতিরিক্ত যোগ

করা হয়। হযরত শায়খ-এর সঙ্গে মুলাকাত হবার আগেই সুলতান মারহাটওয়াড়ার হুকুমত মসনদে 'আলী খান মুহাম্মদের হাওয়ালা করেন এবং স্বয়ং গুলবার্গা পৌছেন। অতঃপর গোটা রাজ্য থেকে মদের দোকান উৎখাত করে শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচলন ও প্রসারে সমগ্র প্রচেস্টা নিয়োজিত করেন। দাক্ষিণাত্যের চোর-ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারীদের যাদের নাম দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল, চুরি-ডাকাতিই ছিল যাদের একমাত্র নেশা ও পেশা, তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করেন। ফলে ছ'সাত মাসের ভেতরেই গোটা দেশ এদের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। একটি বর্ণনা অনুসারে ছয় মাসের ভেতর চোর-ডাকাতদের বিশ হাযার মাথা কেটে বিভিন্ন দিক থেকে গুলবর্গায় আনয়ন করা হয়। সুলতান এই গোটা সময়টা হযরত শায়খ যয়নুদ্দীনের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং একনিষ্ঠ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়াতে থাকেন। শায়খ (র) ও সুলতানকে উৎসাহ প্রদান, সম্মান প্রদর্শন এবং দরকারী হেদায়াত ও পরামর্শ প্রদানে কখনও ত্রুটি করেননি।[১]

চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গদের বিরাট বিরাট খানকাহ্ ভারতবর্ষের যে সমস্ত অংশে ও প্রদেশে স্থাপিত হয়, সেখানকার ইসলামী হুকুমত ও তৎকালীন সুলতানদের হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শন এবং ইসলামী হুকুমতের হেফাজতের ক্ষেত্রে এসব বুযুর্গ কখনই অলসতা প্রদর্শন করেন নি। পাণ্ডুয়াতে স্থাপিত বাংলার জগদ্বিখ্যাত খানকাহ সেখানকার ইসলামী হুকুমতের জন্য শক্তির উৎস ও আশ্রয় লাভের মাধ্যম ছিল। যখন সেখানকার ইসলামী রাজত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের ভিত নড়ে উঠল তখন ঐসব দরবেশ এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং তা পূনর্ব-হালের জন্য সাধ্যমত ও সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রয়াস চালান।[২] অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী "তারীখে মাশায়িখে চিশ্ত"('চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গগণের ইতিহাস') নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হযরত নূর কুত্বে 'আলম ছিলেন শায়খ 'আলাওল হকের উপযুক্ত সন্তান। যে যুগে তিনি হেদায়াত ও ইরশাদের মসনদে সমাসীন ছিলেন সে সময় বাংলার রাজনীতি অত্যন্ত নাযুক অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করছিল। রাজা গণেশ (যিনি রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়ার জায়গীরদার ছিলেন) বাংলার সিংহাসন দখল করে বসেন এবং মুসলমানদের শক্তি সমূলে বিনাশ করতে দৃঢ়সংকল্প হন। হযরত নূর কুত্বে আলম সরাসরি এবং সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র)-এর

---

১. তারিখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড ৫৬০-৬২ পৃ. পুনা সংস্করণ, ১৮৩২;

২. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন গুলাম হুসেন সলীমকৃত রিয়াযুস-সালাতীন, তারিখে বাঙ্গালা, পৃষ্ঠা১১০ থেকে ১১৬

মাধ্যমে সুলতান ইবরাহীম শারকীকে বাংলাদেশ আক্রমণের দাওয়াত দেন। সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর (র)-এর সংকলনগুলিতে সেই সব চিত্তাকর্ষক চিঠিপত্র বিশেষভাবে পড়বার মত যার ভেতর উক্ত রাজনৈতিক টানা-পোড়েন ও সংঘাতের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর (র) যে চিঠি হযরত নূর কুতবে 'আলমের চিঠির জবাবে লিখেছিলেন তা বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় সূফীদের কার্যাবলীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।"[১]

এই কতিপয় ঘটনা থেকেই অনুমান করা যাবে যে, চিশতীয়া সিলসিলার মহান বুযর্গগণের তাসাওউফ শুধুমাত্র নির্জনবাস, আত্মহনন ও দুনিয়া-বর্জন ছিল না। তাঁরা নিজ নিজ কালে যুগের ধারাকে বদলাতে এবং যুগের অবস্থাচক্রের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার চেষ্টাও চালিয়েছেন। অত্যাচারী ও জালিম সুলতানের মুখোমুখি হক-কথা বলতে, তাদের ভুল ও অন্যায় প্রবণতার মুকাবিলা করতে ও রুখে দাঁড়াতে এবং তাদের সলাপরামর্শ দানেও কোনরূপ ইতস্তত করতেন না এবং যখনই তাঁদের মওকা মিলত তাঁরা সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবী প্রয়াস গ্রহণেও দ্বিধা করতেন না।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

চিশতীয়া সিলসিলার বুনিয়াদ ভারতবর্ষের মাটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উপর পড়েছিল এবং তার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর হাতে এত অধিক সংখ্যায় মানুষ মুসলমান হয়েছিল যে, ইতিহাসের এই অন্ধকারে তার পরিমাপ করা কঠিন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যার এই আধিক্য অনেকাংশেই হযরত খাজা চিশতী (র)-এর চেষ্টা-সাধনা ও আধ্যাত্মিকতারই অনিবার্য ফসল। এর মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যা হযরত খাজা (র)-এর রূহানী কুওত, উজ্জ্বল কামালিয়াত এবং আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য ঘটনাবলীর কারণেই মুসলমান হয়েছিল। সে যুগের ভারতবর্ষ যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার বিরাট কেন্দ্র ছিল। এখানকার অনেক ফকীর ও সন্ন্যাসী তান্ত্রিক-যোগসাধনা ও আত্মিক শক্তিতে ছিল অত্যন্ত বলীয়ান। কঠোর কঠিন সাধনা এবং বিভিন্ন প্রকার অনুশীলন ও যোগ্যাভ্যাস দ্বারা তারা কাশ্‌ফ ও সম্মোহনের বিরাট শক্তি আত্মস্থ করে রেখেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে অনেক লোকই এই নবাগত মুসলমান ফকীরকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং তাঁকে তকলীফ দেবার জন্য তাঁর নিকট আসে। কিন্তু তারা সত্বরই জেনে যায় যে, এই বিদেশী মুসাফির দরবেশ তাদের থেকেও আত্মিক ও

১. তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত, ২০২ পৃ.;

সম্মোহনী শক্তিতে অনেক বেশী অগ্রসর এবং অবশেষে ফেরআউনের যাদুকরদের মত তারাও পরিমাপ করতে পারে যে, তাঁর কামালিয়াত ও শক্তির উৎসমূল অন্য কিছু। এরই সঙ্গে তাঁদের চরিত্রের পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্যসুলভ নির্লোভ জীবন যাপন, ঈমান ও একীনের শক্তি, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং মানবতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দর্শনে বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁদের ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয়। তাযকিরা ও তাসাওউফের কিতাবগুলিতে এই সিলসিলায় যোগী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মুকাবিলা এবং হযরত খাজা (র)-এর উজ্জ্বলতর আধ্যাত্মিক শক্তি, কাশ্‌ফ ও সম্মোহনী শক্তির ঘটনাবলী যেরূপ ব্যাপকতর আধিক্যের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও ঐতিহাসিক সনদ থেকে ও প্রাচীনতর সমসাময়িক উ ৎসের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা কঠিন তবুও ভারতবর্ষের সে সময়কার লোকের আগ্রহ ও প্রবণতা এবং আজমীরের ধর্মীয় ও আত্মিক কেন্দ্রিকতা দেখতে গেলে এটা মোটেই যুক্তি বহির্ভূত মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস জনসাধারণকে হযরত খাজা (র)-এর প্রেমিক এবং ইসলাম গ্রহণে উন্মুক্ত করেছিল তা তাঁর একক আত্মিক শক্তি ছিল না বরং তা ছিল তাঁর আধ্যাত্মিকতা, একনিষ্ঠতা, নিষ্কলুষ চরিত্র ও সহজ সরল জীবনযাপন পদ্ধতি যা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণি ও সাধারণ মানুষ এর পূর্বে আর কখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি।

হযরত খাজা (র)-এর সিলসিলার ভেতর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর প্রচেষ্টা ও তাওয়াজ্জুহ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর মজলিস ও খানকাহ্‌তে সকল জাতি-ধর্মের এবং সর্বশ্রেণীর লোকের আগমন ঘটত। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন ঃ

"শায়খুল ইসলাম খাজা ফরীদুদ্দীনের খেদমতে প্রতিটি শ্রেণী ও বর্ণের এবং জাতি-ধর্মের লোক আসত –আসত দরবেশ ও অ-দরবেশও।"

হযরত খাজা (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চতর যোগ্যতা ও আত্মিক শক্তি দান করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে এটা অসম্ভব নয় যে, ইসলাম প্রচারে সেটারও একটা ভূমিকা ছিল এবং নও-মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও কাশ্‌ফ-কারামত দেখেই মুসলমান হয়েছিল। পাঞ্জাব ও পাক-পত্তনের চতুষ্পার্শের বহু জাতি-গোষ্ঠী ও খান্দান তাদের পূর্বপুরুষদের ইসলাম গ্রহণকে হযরত খাজা (র)-এর তাওয়াজ্জুহ ও তবলীগের পরিণতি বলে মনে করেন এবং নিজেদের সম্পর্ক তাঁর দিকে যুক্ত করেন। অধ্যাপক আরনল্ড তাঁর পুস্তক "Preaching of Islam"- এ লিখেছেন ঃ

পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রদেশগুলির অধিবাসীবৃন্দ খাজা বাহাউল হক মুলতানী এবং বাবা ফরীদ পাক-পত্তনীর তা'লীমের কারণে ইসলাম কবুল করে। এ দু'জন মহান বুযুর্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীর নিকট শেষ পাদে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আগমন করেন। বাবা ফরীদ শকরগঞ্জ (র)-এর জীবনী আলোচনা যিনি করেছেন, তিনি লিখেছেন যে, ষোলটি জাতিগোষ্ঠীকে তিনি তাঁর তা'লীম ও তালকীন তথা শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান করে ইসলামে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, উক্ত গ্রন্থকার উক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির মুসলমান হবার বিস্তৃত বিবরণ লিখেননি।[১]

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) ভারতবাসীদের ভেতর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, শধুমাত্র বক্তৃতা-বিবৃতি ও বাণী শ্রবণে কোন লোকের পক্ষে তার প্রাচীন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে ফিরে আসা এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করা, বিশেষ করে হিন্দু জাতির পক্ষে যারা নিজেদের গোড়ামি, জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা তথা ছু ৎমার্গ কঠোরভাবে মেনে চলত-তাদেরকে শুধুমাত্র বক্তৃতার চমৎকারিত্বে ও ওয়াজ-নসীহতের মনোহারিত্বে মুসলমান বানিয়ে ফেলা মোটেই সহজ নয়॥ তার জন্য প্রভাবশালী ও দীর্ঘ সোহবতের প্রয়োজন।

"ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একবার একজন মুসলিম ক্রীতদাস হযরত খাজা (র)-এর মুবারক মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার সাথে তার এক হিন্দু বন্ধুকেও নিয়ে আসে। সে বলল, এ আমার ভাই। হযরত খাজা (র) উক্ত ক্রীতদাস বলল, একে হযরতের পবিত্র খেদমতে এজন্যেই নিয়ে এসেছি যেন আপনার কৃপাদৃষ্টির বরকতে সে মুসলমান হয়ে যায়। একথা শোনা মাত্রই হযরত খাজা (র) -এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কারও বলার কারণে এ জাতির মন-মানস ও অন্তর-রাজ্যের পরিবর্তন হয় না। অবশ্য হ্যাঁ ! এর যদি আল্লাহ্র কোন নেক বান্দার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য ঘটে তবে আশা করা যায় যে, তার পবিত্র সোহবতের বরকতে সে মুসলমান হয়েও যেতে পারে।[২]

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সময়ে যেখানে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) দিল্লীর ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে হেদায়াত ও ইরশাদ-এর আসনে সমাসীন ছিলেন এবং তাঁর খানকাহ্র দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য খোলা ছিল, আর এটা ছিল সেই যুগ যখন ভারতবর্ষের দুরদূরান্তর ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ও বিভিন্ন উপলক্ষে লাখ লাখ

১. দাওয়াতে ইসলাম-মওলবী 'ইনায়েতুল্লাহ কৃত অনুবাদ, পৃ. ২৯৭;

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১৮২ পৃষ্ঠা;

অমুসলিম দিল্লীতে আগমন করত এবং নিজেদের জাতীয় শুভ ধারণার ভিত্তিতে হযরত খাজা (র)- এর পবিত্র যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যেও হাযির হ'ত–বিরাট সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মেওয়াট এলাকায় যা হযরত খাজা (র)-এর কেন্দ্র গিয়াছপুর থেকে দক্ষিণ দিকের খানিকটা সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের রাহাজানী ও অবাধ্য আচরণের কারণে কিছুকাল পূর্বে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদের যমানায় শহরের আশ্রয়-প্রাচীর দিল্লী দরজা সন্ধ্যা লাগতেই বন্ধ হয়ে যেত-হযরত খাজা (র)-এর ফয়েয ও বরকতে এবং তাঁর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাবে সেই মেওয়াটিরাও উপকৃত হয়ে থাকবে এবং এটা আদৌ আশ্চর্য নয় যে, তারা বিরাট সংখ্যায় তাঁরই যমানায় মুসলমানও হয়ে থাকবে।

চিশতীয়া তরীকার খানকাহগুলি নিজ নিজ প্রভাবাধীনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকার অমুসলিম অধিবাসীদেরকে নিজেদের আমল-আখলাক,রূহানী ভাবধারা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব দ্বারা যার পরিবেশ উক্ত খানকাহ্গুলিতে বিদ্যমান ছিল, অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। পাভুয়ার চিশতীয়া খানকাহ্ এবং আহমদাবাদ ও গুলবর্গার চিশতী বুযুর্গদের প্রভাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠির একটি বিরাট অংশের মুসলমান হওয়া আদৌ অমূলক কল্পনা নয়। একাদশ শতাব্দীতে চিশতীয়া সিলসিলার মুজাদ্দিদ হযরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদী ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত শায়খ নিজামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছেন তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এর জন্য তাকীদ ও হেদায়াত লক্ষ্য করা যায়। এগুলি পাঠে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-অস্থিরতার পরিমাপ করা যায়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

در آں کوشید که صورت اسلام ووسیع " کردں وذاکریں کثیر.

"ইসলামের সীমানার যেন বিস্তৃতি ঘটে এবং এর অনুসারীর সংখ্যা যেন ব্যাপকভাবে বর্ধিত হয় সেজন্য কোশেশ করবে।"

অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী লিখেছেন ঃ

"শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর তবলীগী চেষ্টা-সাধনার ফল এই হয়েছিল যে, বহু হিন্দুই ইসলামের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়। কতক লোক যদিও আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করত না, কিন্তু অন্তর থেকে তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।'

নিতান্তই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, কেউই ভারতবর্ষের মহান বুযুর্গদের, বিশেষ করে চিশতীয়া সিলসিলার বুযুর্গদের তবলীগী প্রয়াসের ইতিহাস

ও বিবরণী লিপিবদ্ধ করার শ্রম স্বীকারে রাযী হয় নি। কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত– ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইসলামের এই সব শ্রদ্ধেয় মহান সূফী ও ফকীর-দরবেশগণই এবং এটাও দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তাসাওউফের এ ধারাবাহিকতায় চিশতীয়া সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গগণের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং এক্ষেত্রে তাঁদের অংশ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

'ইল্‌ম-এর খেদমত ও প্রচার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) ও তাঁর খলীফাগণ তাঁদের অনুসারীবৃন্দের 'ইল্‌ম হাসিল ও তার পূর্ণতা প্রাপ্তির ব্যাপারে কতখানি উৎসুক ছিলেন তার পরিমাপ হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র)-এর কথিত উক্তি এবং স্বয়ং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খলীফা শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উছমানী আওধী (আখী সিরাজ, প্রতিষ্ঠাতা, পাণ্ডুয়া খানকাহ্)-এর সঙ্গে কৃত আচরণ থেকে অনুমাণ করা যাবে। তিনি যতদিন পর্যন্ত 'ইল্‌ম হাসিল ও তার পূর্ণতা অর্জন না করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে শরঈ ও রূহানী ক্ষেত্রে কোনো কিছুর এজাযত দেন নি। এর সুফল এই হয়েছিল যে, ধর্মীয় শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন, দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন এবং ইস্‌লামের প্রচার ও প্রসার উভয়টিই এই সিলসিলার ইতিহাসে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এই সহাবস্থান মুসলমানদের অবনতি ও অধঃপতন কাল পর্যন্ত চলেছিল। হযরত খাজা (র)-এর একজন খলীফা মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া ঐ যুগের বহু 'উলামায়ে কিরাম ও মুদাররিসীনের উস্তাদ ছিলেন। শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন ঃ

سالت العلم من احياك حقا
فقال العلم شمس الدين يحيي

অর্থাৎ আমি ' ইল্‌মকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমাকে সত্যিকার জীবন কে দান করেছে; উত্তরে সে মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া (র)-এর নাম উল্লেখ করল।

শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত-অনুরক্তদের মধ্যে কাযী 'আবদুল মুকতাদির কুন্দী (ওফাত ৭৯১), তাঁর প্রিয় শাগরিদ শায়খ আহমাদ থানেশ্বরী (ওফাত ৮২০ হি) এবং মাওলানা খাওয়াজগী দেহলভী (ওফাত ৮০৯ হি) ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'উলামা, উস্তাদকুল শিরোমণি ও 'ইল্‌মের মুজাদ্দিদবর্গের অন্যতম ছিলেন। কাযী 'আবদুল মুকতাদির এবং

মাওলানা খাওয়াজগীর প্রিয় শাগরিদ শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে 'উমর দৌলতাবাদী (ওফাত ৮৪৯ হি) ভারতীয় উপমহাদেশের গৌরব ও মুল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতেন। আর মালিকুল 'উলামা শিহাবুদ্দীনের নাম ভারতবর্ষের জ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে বিরাজিত ও বিকশিত ছিল। তাঁর 'শরাহ কাফিয়া' (শরাহ হিন্দী' নামে আরব ও অনারব সর্বত্রই মশহূর)-এর টীকাকারদের মধ্যে 'আল্লামা গাযরূনী এবং মীর গিয়াছুদ্দীন মনসূর শিরাজীর ন্যায় মহান ব্যক্তিও রয়েছেন। ইনিই তিনি যিনি রোগাক্রান্ত হলে সুলতান ইবরাহীম শারকী পানির পেয়ালা ভরে তার পক্ষে সাদ্কা করেন এবং দু'আ করেন যে, মালিকুল 'উলামা আমার সালতানাতের 'ইয্যত ও আবরূস্বরূপ। তাঁর মৃত্যু যদি অবধারিত হয়েই থাকে তবে তাঁর পরিবর্তে আমাকেই যেন কবুল করা হয়।

এই সিলসিলার একজন বুযুর্গ আলিম মাওলানা জামালুল আওলিয়া শিবলী লোদী (ওফাত, ১০৪৭ হি.) যাঁর প্রখ্যাত ও নামকরা শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে মাওলানা লুতফুল্লাহ কুর্দী, শায়খ মুহাম্মদ তিরমিযী কালপভী, শায়খ মুহাম্মদ রশীদ জৌনপুরী এবং সাইয়্যেদ ইয়াসীন বানারসীর মত মহান 'আলিম ও যমানার শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ রয়েছেন। মাওলানা লুতফুল্লাহ কুর্দীর শাগরিদ ছিলেন হিন্দুস্তানের মশহূর 'আলিম মাওলানা আহমাদ মিঠোভী ওরফে হামীদ আহমাদ, কাযী 'আলীমুল্লাহ্ কুচেন্দোভী এবং মাওলানা 'আলী আসগর কনৌজী যাঁরা দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন-এর তৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং বড় বড় খ্যাতনামা 'আলিম ও মুদাররিস তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্র (হালকায়ে দরস) থেকে উপযুক্ততা ও পরিপূর্ণতা হাসিল করে বের হয়ে আসেন। টিলাওয়ালী মসজিদের প্রখ্যাত দারুল 'উলূম যার দায়িত্বে ছিলেন শাহ পীর মুহাম্মদ লাখনৌভী (ওফাত ১০৮৫ হি.) এই সিলসিলার তা'লীম ও রূহানীয়াতের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। স্বয়ং দরসে নিজামী[১] (যার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত)-এর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামুদ্দীন (ওফাত, ১১৬১ হি.) -এর বিখ্যাত খলীফা ও বংশধর এই সিলসিলার সঙ্গে রূহানী সম্পর্ক রাখতেন। এছাড়া সাধারণভাবেও চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানপ্রীতি একটি ঐতিহাসিক সত্য যা হযরত নূর কুতবে 'আলম, হযরত জাহাঙ্গীর আশরাফ সিমনানী, হযরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদীর চিঠিপত্রে পাণ্ডুয়া, গুলবর্গা, মানিকপুর, সলোন ইত্যাদি খানকাহগুলির শিক্ষামূলক তৎপরতা ও এর প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন থেকে সহজেই আঁচ করা যায়।

---

১. মোল্লা নিজামুদ্দীন কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী প্রদত্ত শিক্ষা পদ্ধতি। - অনুবাদক।

শেষ কথা

চিশতীয়া সিলসিলার ইতিহাসে এই উজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত করার পূর্বে ক'টি তিক্ত সত্য প্রকাশ করে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাসাওউফ ও রূহানী ভাবধারার ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, প্রত্যেকটি সিলসিলার প্রারম্ভ জোরালো উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রবল আবেগ-অনুপ্রেরণ দ্বারাই হয়েছে। এখানেও যে সিলসিলার প্রারম্ভ 'ইশ্ক, মুহব্বত, যুহ্দ ও আত্মোৎসর্গ, দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা, রিয়াযত ও মুজাহাদা, দাওয়াত ও তবলীগ দিয়ে হয়েছিল, তার ভেতর ক্রমান্বয়ে এমন সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এর ব্যবস্থাপনায় তিনটি উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াশীল বস্তু রয়ে গেছে।

(ক) ওয়াহ্দাতু'ল-ওজুদের 'আকীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, এর প্রচারে সীমাহীন আগ্রহ এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যায়গুলোর ঘোষণা ও অবাধ আলোচনা।

(খ) মাহফিলে সামা'র আধিক্য, ভাবাবেগ ও নৃত্যের মাত্রাতিরিক্ততা।

(গ) শরীয়তের বাধা-নিষেধ বহির্ভূত ওরস অনুষ্ঠানের আয়োজন, তার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি।

সে সমস্ত আমল, রসম-রেওয়াজ ও 'আকীদা–যার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য খালেস ও বিশুদ্ধ দীনের এসব দৃঢ়চেতা ও মনোবলসম্পন্ন মুবাল্লিগবৃন্দ ইরান ও তুকিস্তানের দূরদুরান্ত থেকে এসেছিলেন– ক্রমে ক্রমে তাঁদের খানকাহগুলি এমন রূপ লাভ করেছিল যে, অমুসলিম জনবসতিগুলির জন্য এটা একটি বিব্রতকর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যে, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ভেতর (যে সবের সংস্কার ও সংশোধনের নিমিত্ত ইসলামের এসব মুবাল্লিগ জল-স্থল অতিক্রম করে তশরীফ এনেছিলেন) কার্যত পার্থক্য কি? তাওহীদ' শব্দের ব্যবহার এবং তাওহীদের দাওয়াত ওয়াহদাতু'ল ওজুদের অর্থের ভেতরই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সুন্নত ও শরীয়তের অনুসরণ– যে বিষয়ের উপর ঐ সমস্ত বুযুর্গ এত বেশী জোর দিয়েছিলেন॥ জাহেরীপন্থীদের প্রতীক চিহ্ন এবং হাকীকত অজ্ঞ লোকদের আলামত হিসেবে রূপলাভ করে। শরীয়ত ও তরীকত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের নাম হিসেবে মেনে নেওয়া হয়-- যার মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্নতাই নয়, পারস্পরিক বিরোধও বর্তমান। বাদ্যযন্ত্র ও সামা'র যান্ত্রিক উপকরণসমূহ যেগুলিকে পূর্ববর্তী যুগের বুযুর্গগণ এত কঠোর কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন তা এই তরীকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ব্যথা-বেদনা ও 'ইশকের উপাদান যা ছিল চিশতীয়া তরীকার পুঁজি ও মূলধন, –আজকের বাজারে এর এত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে যে, সত্য

সন্ধানীকে আজ আফসোসের সঙ্গে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, দারিদ্র্য যে তরীকার ছিল গর্ব ও অহংকার, আজ তাই আমীরী চাল-চলন ও ঠাট-বাটে পরিণত হয়েছে।

এসবের থেকে বেশী বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের সকরুণ পরিণতি এই যে, আল্লাহ্র যে সমস্ত বান্দাহ্র জীবনের লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্র সকল বান্দাহ্র মাথাকে দুনিয়ার তামাম আস্তানা থেকে উঠিয়ে একক আল্লাহ্র আস্তানার দিকে ঝুকিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য সব বস্তুতে আটকে পড়া অন্তরকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া এবং যাঁদের দাওয়াত ও জীবন-যিন্দেগী ছিল আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) -এর জীবন ও যিন্দেগীর প্রতিচ্ছবি আর নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ . وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا . اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

" কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে যে, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও,' এটা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে –তোমরা রাব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।"

" ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফির হতে বলবে?" (সূরা আল-ইমরান, ৮ম রুকু') যমানার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে স্বয়ং তাঁরাই প্রার্থীত বস্ত ও লক্ষ্য এবং তাঁদের আস্তানাগুলিই সিজদাস্থল ও উপাস্য বস্তুত পরিণত হয়েছে।

তামামশোদ

অনুবাদক ঃ

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী নিয়ে যখন মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন (১৯৭৮) তখনো তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না। সিলেটের আল্লামা মুহাম্মদ মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রহ)-এর সুকঠিন উর্দূ গ্রন্থ "ফাৎহু'ল-করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যি'ল-আমীন"-এর বঙ্গানুবাদ 'ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার' অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর প্রথম প্রবেশ। অতঃপর একে একে 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' ['মহানবীর (সা) প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে ২য় সং. প্রকাশিত], ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩ খণ্ড), ঈমান যখন জাগলো, খালিদ বিন ওয়ালীদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রভৃতির মত কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ তিনি পাঠক সমাজকে উপহার দেন। এ পর্যায়ে তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে 'নবীয়ে রহমত'। এমন একটি গ্রন্থের অনুবাদে যেটুকু যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা যে আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর রয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পাঠক নিজেই তাঁর পরিচয় পাবেন। অনুবাদক বর্তমানে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের পরিচালক এবং বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সদস্য-সচিবরূপে দেশের বয়োবৃদ্ধ সুধীদের যে মূল্যবান সাহচর্য পেয়েছেন ও পাচ্ছেন তা তাঁকে যে কতটুকু পরিশীলিত ও যোগ্য করে তুলেছে "নবীয়ে রহমত"-এর পাতায় পাতায় তার পরিচয় রয়েছে। আমরা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের দীর্ঘায়ু ও অনুবাদকের কর্মময় জীবনের সাফল্য কামনা করি।